আল কোরআনের মানদণ্ডে

সফলতা ও ব্যর্থতা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

আল কোরআনের মানদন্ডে

সফলতা ও ব্যর্থতা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

আল কোরআনের মানদন্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৪

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ কোবা কম্পিউটার এন্ড এ্যাডভারটাইজিং

৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ৪০/- টাকা

আলোচিত বিষয়

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্‌সীর

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি

কর্তৃক রচিত বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

সূরা আল ফাতিহা, সূরা আল আসর, সূরা লুকমান, আমপারা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ

দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান

মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন

বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১ ও ২

শাহাদাতই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

আল্লাহ্ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?

হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন

শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়?

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোনাজাত

আল্লাহ কোথায় আছেন?

মানব জীবনে সময়ের গুরুত্ব

বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের ত্রিশ পারার ছোট্ট সূরার নাম আল আসর। মাত্র তিন আয়াত বিশিষ্ট এই ছোট্ট সূরার প্রথম আয়াতেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সময়, কাল বা ইতিহাসের শপথ করে বলেছেন যে, সমস্ত মানুষ এক মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। বিশেষ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশের মানুষ সম্পর্কে এ কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে সমস্ত মানব মন্ডলীর কথা। সমস্ত মানুষ ক্রমশঃ মহাক্ষতির দিকে এবং নিরুদ্দেশের পথে অতি দ্রুতগতিতে ধাবমান। যে ক্ষতিকর পথে মানুষ এগিয়ে চলেছে সে পথের শেষে রয়েছে এক মহাধ্বংস গহ্বর। তবে সেইসব লোকগুলো এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে, যাদের মধ্যে চারটি গুণের সমাহার ঘটেছে। প্রথম গুণটি হলো ঈমান। দ্বিতীয় গুণটি হলো আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ। তৃতীয় গুণটি হলো মহাসত্যের ব্যাপারে একে অপরকে উপদেশ দেয়া বা উৎসাহিত করা। চতুর্থ গুণটি হলো, মহাসত্য গ্রহণ করার পরে যে সব পরীক্ষা আসে, সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া এবং এ ব্যাপারে পরস্পরকে উৎসাহিত করা।

এখানে প্রশ্ন জাগে, এই কথাগুলো বলার জন্য কেনো সময়ের শপথ করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ কোন বিষয়ের বা কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অথবা নিশ্চিত করে বলার জন্য মহান আল্লাহর নামে শপথ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ যখন কোন বিষয়ের শপথ করে যে কথা বলতে চান, শপথকৃত বিষয়ের সাথে মূল কথার এক অপূর্ব সামঞ্জস্য থাকে। যে কথাটি তিনি বলতে চান, শপথকৃত উক্ত জিনিস তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তিনি সে বিষয়ের শপথ করেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা আসরে কালের শপথ করেছেন। কাল বা সময় অত্যন্ত তীব্র গতিতে মানব জীবনকে জীবনের শেষ প্রান্তে অগ্রসর করিয়ে দিচ্ছে। এ জন্য সময় মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে যতটুকু সময়কাল নির্ধারণ করেছেন, তার অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও কারো পক্ষে এখানে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে মানুষ সময়ের যে হিসাব করে, সেই সময় অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যদি ৮০ বছর তিনদিন তিন ঘন্টা তেত্রিশ সেকেন্ড নির্ধারণ করে রাখেন, তাহলে সে ব্যক্তি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত যাবতীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে চৌত্রিশ সেকেন্ড অবস্থান করতে পারবে না। মানব সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সময়কাল

থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নির্ধারিত এই সময়ের খুব কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। মানব সন্তান শৈশব অতিক্রম করে কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের কোঠা ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করছে, এর অর্থ হলো বদ্ধ কলি থেকে ফুল যেন প্রস্ফুটিত হলো। আর ফুল প্রস্ফুটিত হবার অর্থই হলো এখন সে যে কোন মুহূর্তে ঝরে যাবে। রোদ, বৃষ্টি-ঝড়ে ফুল ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে হরিদ্রাভা ধারণ করে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। মানুষ যৌবনে পদার্পণ করার অর্থই হলো সে এখন ক্রমশ প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়ে পৃথিবীকে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

মানব জীবনের সোনালী যৌবনের সৌরভ দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, মহাকাল সেই সৌরভ ক্রমশ নিঃশেষে চুষে নেয়। যৌবনের সুষমা, লাবণ্য আর মাধুরীময় আভা মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায়। যে সময় মানব জীবন থেকে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, সে সময় প্রাণান্তকর সাধনার পরেও আর ফিরে পাওয়া যায় না। মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অমূল্য দান হচ্ছে মহামূল্য সময়। এই সময়ই মানুষকে পরিপক্ক করে, কোনো মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্মলাভ করে না। নদীর স্রোত আর কালের স্রোতের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, নদীর স্রোত ইচ্ছে করলে থামিয়ে দেয়া বা তার গতি পরিবর্তনও করা যায়, কিন্তু কালের স্রোতের ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। অর্থের অপব্যবহার করলে তাকে অমিতব্যায়ী বলে, কিন্তু সবচেয়ে বড় অমিতব্যায়ী হলো সময়ের অপব্যবহার যে করে। কারণ সময় হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর মানুষ এই বড় সম্পদই সবচেয়ে বেশী অপচয় করে থাকে।

আজকের এই নবীন উষা কিছুকাল পরে অতীতের স্বপ্ন বলে মনে হবে। অর্থ সম্পদ হারালে তা ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে পূরণ করা যায়। জ্ঞানের অভাব হলে তা অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করা যায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সংযম বা ওষুধের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে তা চিরদিনের জন্যই হারিয়ে যায়। বর্তমান বলে কিছুই নেই, যে মুহূর্তে যাকে বর্তমান বলি, সেই মুহূর্তেই তা অতীত হয়ে যায়, অতএব কালের মধ্যে আছে কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ–আর তাদের মধ্যে হাইফেন হয়ে আছে পরিস্থিতিহীন বিন্দুমাত্র বর্তমান, যা থেকেও নেই, যা এক মুহূর্তে থেকে সেই মুহূর্তেই নেই হয়ে যায়, এরই নাম সময়। যে ফুল গভীর নিশীথে ঝরে পড়েছে, তা আর কখনোই ফুটবে না। যে সময় চলে যাচ্ছে মানব জীবনের ওপর দিয়ে, তা আর ফিরে আসবে না।

এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা সময়ের শপথ করেছেন, কারণ এই জীবনের সময়কাল অতিদ্রুত ফুরিয়ে আসছে, অথচ সেই সময়কে আল্লাহর নির্দেশিত পথে

ব্যয় করা হচ্ছে না। এই জন্যই বলা হয়েছে, সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, ব্যতিক্রম শুধু তারাই–যারা জীবনকালকে উল্লেখিত চারটি গুণে গুণান্বিত করে অতিবাহিত করছে।

এখানে বর্তমান বলে কিছুই নেই–এই মুহূর্তটি পর মুহূর্তেই অতীতের গর্ভে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। প্রতিটি অনাগত মুহূর্ত এসে ভবিষ্যতকে বর্তমানে রূপান্তরিত করছে এবং বর্তমান মুহূর্ত চোখের পলকে অতিবাহিত হয়ে কালের গর্ভে প্রবেশ করে বর্তমানকে অতীতে রূপান্তরিত করছে। বাড়ির ঘড়িটি সেকেন্ডের স্তর পার হয়ে মিনিট অতিক্রম করে ঘন্টা চিহ্নিত স্থানে গিয়ে শব্দ করে বাড়ির মালিককে এ কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, 'ওহে গৃহকর্তা! এখনো সাবধান হও, তোমার জন্য নির্দিষ্ট জীবনকাল থেকে একটি ঘন্টা পুনরায় কোনদিন ফিরে না আসার জন্য মহাকালের বিবরে গিয়ে প্রবেশ করলো।' মানুষ তার জীবনকাল সম্পর্কে দীর্ঘ আশা পোষণ করে অথচ ক্ষণপরে কি ঘটবে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। কবি বলেছেন–

اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہی
سامان سو برس کا ھے کل کی خبر نہی

আগাহ্ আপনি মওত সে কো-ই বাশার নেহি
সামান সও বরস্ কা হ্যায় কাল কি খবর নেহি।

মানুষ সজাগ সচেতন নয়, মৃত্যুর ভয়শূন্য তার হৃদয়। মুহূর্ত পরে কি ঘটবে তা তার জানা নেই অথচ সে শত বছরের জীবন-যাপনের উপায়-উপকরণ যোগাড়ে ব্যস্ত।

মানব জীবন নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ

পৃথিবীর শিক্ষাঙ্গনসমূহে যখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তখন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। প্রশ্ন পত্রের ওপরে লেখা থাকে, 'সময়–৩ ঘন্টা।' অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলা হয়েছে, তা তিন ঘন্টার মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে। শুধু লিখলেই চলবে না, সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রশ্নের সঠিক উত্তর যথাযথভাবে লিখতে হবে। তাহলেই কেবল পরীক্ষায় যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। নির্দিষ্ট এই সময় অতিক্রান্ত হলে পরীক্ষার্থীকে সময় দেয়া হয় না। পরীক্ষার্থী যদি পরীক্ষার স্থানে প্রশ্নের উত্তর না লিখে সময় ক্ষেপণ করে, তাহলে সে কোনভাবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরে পরীক্ষার্থী যত অনুরোধই করুক না কেন, তাকে কিছুতেই সময় দেয়া হয় না।

মানব জীবনের বিষয়টিও ঠিক এমনি। এই পৃথিবীতে তাকে নির্দিষ্ট সময়কাল দেয়া হয়েছে এবং তাকে এখানে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এখানে তার কাজ হলো সে আঁকা-বাঁকা পথ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ যে পথ তাকে প্রদর্শন করেছেন, সেই পথে সে তার জীবনকাল অতিবাহিত করবে। সময় মানব জীবনের প্রকৃত মূলধন। এই মূলধন তাকে যথার্থ পন্থায় ব্যয় করতে হবে। যে কাজের জন্য বরফ নিয়ে আসা হলো, সেই কাজে বরফ ব্যবহার না করে তা যদি ফেলে রাখা হয়, তাহলে সে বরফ তো অত্যন্ত দ্রুত গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তা কোনো কাজেই লাগবে না।

মানুষের জীবনও বরফের মতোই। তাকে যে নির্ধারিত জীবনকাল দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কালের কৃষ্ণকালো বিবরে গিয়ে প্রবেশ করছে। মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সময়কে যদি অপচয় করা হয় বা সৃষ্টি জগতের প্রতি পালক মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে তা ব্যয় করা হয়, তাহলে এ কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, সে মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সে স্বয়ং নিজের যে ক্ষতি করছে, সেই ক্ষতি কখনো পুষিয়ে নেয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ জন্য কালের শপথ করে বলেছেন, মহাকালের তীব্র গতিশীল স্রোতই জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, চারটি গুণ বিবর্জিত মানুষ অর্থহীন কাজে নিজের মহামূল্যবান জীবনকাল ক্ষয় করছে, তা সবই অকল্পনীয় ক্ষতিকর বিষয়। এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে কেবলমাত্র মুক্ত থাকতে পারবে তারাই, যারা নিজের জীবনে উক্ত চারটি গুণ অর্জন করেছে তথা নিজেকে উক্ত চারটি গুণে গুণান্বিত করেছে। আলোচ্য সূরায় যে ক্ষতির কথা বলা হয়েছে, তা শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়–ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দল, গোষ্ঠী তথা পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। তীব্র হলাহল–গরল যদি কোনো ব্যক্তি পান করে, তাহলে তার ওপর যেমন গরলের প্রতিক্রিয়া হবে, তেমনি সমাজের সকল ব্যক্তি বা একটি দেশের সকল জনগণ যদি তা পান করে, তাহলে এক ব্যক্তির ওপরে তা যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, গোটা দেশের জনগণের উপরও সেই একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

সূরা আসরে আল্লাহ তা'য়ালা চারটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। সে চারটি গুণ হলো– ঈমান, আমলে সালেহ তথা সৎকাজ, মহাসত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান তথা হকের দা'ওয়াত এবং এ কাজ করতে গিয়ে যে ধৈর্যের প্রয়োজন, সেই ধৈর্য নামক মহান দুর্লভ গুণ। এই চারটি গুণ সম্পর্কে তাফসীরে সাঈদী-সূরা আল

আসরের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই চারটি গুণের অভাবে যেমন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা মানব সভ্যতা। এই সূরায় উদ্ধৃত চারটি মৌলিক গুণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি ও জাতি এক মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এটা এমনই এক ক্ষতি যে, এই ক্ষতি কোনভাবেই পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হতে পারে, ক্ষতির ধরনটা কেমন? কারণ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তারা যে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত–সেটা তেমন একটা বুঝা যায় না। কারণ তারা একের পর এক আবিষ্কার করে গোটা পৃথিবীর মানব সভ্যতাকে অবাক করে দিচ্ছে। তাদের জীবন যাত্রার মান ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমরাস্ত্র ইত্যাদি–দিক থেকে ক্রমশঃ উন্নতিই করছে। অর্থাৎ এই দৃশ্যই সর্বত্র দেখা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত চারটি গুণ ব্যতীতই তারা সফলতা ও কল্যাণ লাভ করছে।

ক্ষতির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য

এ কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর কোরআন আলমে আখিরাতে মানুষের সাফল্য লাভকেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ এবং সেই জগতে তার ব্যর্থতাকেই প্রকৃত ব্যর্থতা বা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই পৃথিবীতে এক ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাঙ্গন থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করলো, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের মূল কর্ণধারের পদটি তাকে দেয়া হলো এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ তাকে নেতা হিসাবে অনুসরণ করলো, ভোগ-বিলাসের যাবতীয় উপায়-উপকরণ তার পদানত হলো, কোন কিছুর অভাব এবং দৈন্যতার সাথে তার কখনো পরিচয় ঘটলো না, গোটা বিশ্বের ওপরে তার একচ্ছত্র ক্ষমতা পাকাপোক্ত হলো, মানুষের দৃষ্টিতে এই লোকটিই হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সফলতার অধিকারী এবং তার মাতা-পিতা একজন সফল সন্তানের অধিকারী হিসাবে মানুষের কাছে বিবেচিত হলো।

পক্ষান্তরে মানুষের দৃষ্টিতে সেই সফল ব্যক্তি তার জীবনে মুহূর্ত কালের জন্যও তার আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি আদেশও মানলো না, বরং তার গোটা জীবনকাল ব্যাপী লোকটি পৃথিবী থেকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী দল ও লোকগুলোর প্রতি জুলুম অত্যাচার চালালো, আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদেরকে কারারুদ্ধ করলো। এই ব্যক্তি মৃত্যুর পরের জগতে

সবথেকে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবে এবং সবার তুলনায় এই ব্যক্তিই ব্যর্থতার মুখোমুখি হবে। পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহ বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, হাশরের ময়দানে তাদের সৎকর্মের পাল্লা ভারী হবে এবং এরাই সফলতা অর্জন করবে। আর যারা মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, তাদের পাল্লা হাল্কা হবে এবং এরাই হবে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه فَأُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِايٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ-

যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কারণ তারা আমার বিধানের সাথে জালিমদের অনুরূপ আচরণ করছিলো। (সূরা আ'রাফ–৮-৯)

আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ব্যর্থ হবে

মানুষ মূলতঃ সৃষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহর গোলামী করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করার পরপরই তাদেরকে আপন স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আমি কি তোমাদের রব নই? সমস্ত মানুষ সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি-নিশ্চয়ই আপনিই আমাদের রব।' অর্থাৎ আমরা একমাত্র আপনারই আইন-কানুন ও বিধান অনুসরণ করবো এবং আপনারই দাসত্ব করবো। আপনার দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করবো। এভাবে মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আনুগত্যের স্বীকৃতি (Oath of allegiance) দিয়েছে।

সমস্ত সৃষ্টিলোকও সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষকে একমাত্র ঐ রব-এরই গোলামী করতে হবে, যিনি তাকে অনুগ্রহ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবন ধারণের জন্য যাবতীয় কিছু তার অনুকূল করে দিয়েছেন। সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে মানুষ তার আপন রব-এর কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, সে তাঁরই গোলামী করবে। এরপর পৃথিবীতে এসে যারা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে অথবা মানুষের বানানো বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে, তারাই মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ

مِيْثَاقِهِ-وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَاللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করে নেয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যাকে যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা বাকারা-২৭)

এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, মানুষ যতক্ষণ একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকেই আইনদাতা, বিধানদাতা হিসাবে অনুসরণ করে, ততক্ষণ সে নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন ধারণ করতে পারে। আর যখনই মানুষ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ত্যাগ করে ভিন্ন কোন বিধান অনুসরণ করে, তখনই সে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় নিমজ্জিত হয় এবং গোটা পৃথিবীব্যাপী ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দেয়। সুতরাং যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে তারাই সফল আর যারা এই বিধান ত্যাগ করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يَّكْفُرْبِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

যারা এর সাথে (আল্লাহর বিধানের সাথে) কুফরী আচরণ করে মূলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা বাকারা-১২১)

প্রকৃত দেউলিয়া কোন্ ব্যক্তি

এই পৃথিবীতে মানুষ পরকাল ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হলেই কেবলমাত্র সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। কারণ একমাত্র পরকালের ভয় তথা পৃথিবীর যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এই অনুভূতিসম্পন্ন লোকদের পক্ষেই এই পৃথিবীকে একটি শান্তির নীড় হিসাবে গড়া সম্ভব। আর যাদের ভেতরে সেই অনুভূতিই নেই, তারাই মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং এরাই হলো সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قَدْ خَسِرَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ-

ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেসব লোক, যারা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার খবরকে মিথ্যা মনে করেছে। (সূরা আনআ'ম-৩১)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিই সবথেকে সফলতা অর্জন করলো, যে ব্যক্তি তার গোটা জীবনকাল ব্যাপী আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে নিজের

জীবন পরিচালিত করলো তথা সূরা আসরে উল্লেখিত চারটি গুণ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করলো। যদিও সে ব্যক্তি পৃথিবীতে চরম অভাবের ভেতরে জীবন অতিবাহিত করেছে–তবুও সে তাঁর স্রষ্টা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সফলতা ও কল্যাণ অর্জন করেছে। মোট কথা, পরকালে যারা সফলতা অর্জন করতে পারবে কেবলমাত্র তারাই সফল হবে আর পরকালে যারা ব্যর্থ হবে, তারাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত এবং এটাই স্পষ্ট দেউলিয়াপনা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ–

বলো প্রকৃত দেউলিয়া তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবার, পরিজনকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভালো করে শুনে নাও, এটিই হচ্ছে স্পষ্ট দেউলিয়াপনা। (সূরা আয্ যুমার-১৫)

কোন মানুষের ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত সমস্ত পুঁজি যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যবসার অঙ্গনে তার পাওনাদারের সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি পায় যে, নিজের যাবতীয় কিছু দিয়েও সে দেনামুক্ত হতে পারে না তাহলে এই অবস্থাকেই সাধারণভাবে দেউলিয়া (Bankrupt) বলে। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ইসলাম বিরোধিদেরকে লক্ষ্য করে এই রূপক ভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। মানুষ এই পৃথিবীতে জীবন, আয়ু, জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি, মেধা, দেহ, শক্তি, যোগ্যতা, যাবতীয় উপায়-উপকরণ এবং সুযোগ-সুবিধাসহ যত জিনিস মানুষ লাভ করেছে তার সমষ্টি এমন একটি পুঁজি যা সে পৃথিবীর জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যয় করে।

কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর দেয়া এ পুঁজির সবটুকু এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ব্যয় করে যে, এমন কোন শক্তি নেই যার আইন তাকে মেনে চলতে হবে এবং পরকালে একমাত্র তাঁর কাছেই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। অথবা পৃথিবীতে যেসব কৃত্রিম শক্তি রয়েছে সে তার গোলাম এবং এসব শক্তির আইন তাকে মেনে চলতে হবে এবং মাথানত করতে হবে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং নিজের সমস্ত কিছুই হারিয়ে ফেললো। এটা হলো প্রথম ক্ষতি। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষতি হলো, এই ভ্রান্ত অনুমানের ভিত্তিতে সে যত কাজই করলো সেসব কাজের ক্ষেত্রে সে নিজেকেসহ পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ, ভবিষ্যৎ বংশধর এবং মহান আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর গোটা জীবনকালব্যাপী না-ইনসাফী করলো।

সুতরাং এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসংখ্য দাবীদার আত্মপ্রকাশ করলো। কিন্তু তার কাছে এমন কিছুই নেই যে, সে এসব দাবী পূরণ করতে সক্ষম। এ ছাড়া আরো ক্ষতি হচ্ছে, সে ব্যক্তি নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হলো না, বরং নিজের সন্তান-সন্ততি, নিকট আত্মীয়, প্রিয়জন ও পরিচিত মহল এবং নিজের জাতিকেও তার ভ্রান্ত চিন্তাধারা, প্রভাব, শিক্ষা ও আচার-আচরণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। এ গুলো মানুষের জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি। সুতরাং পরকালের সফলতাই প্রকৃত সফলতা এবং পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ–

প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। (আশ শূরা-৪৫)

ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে

পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং কোরআন ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, দ্বীনি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিজেদের শারীরিক শক্তি, মেধা, অর্জিত অর্থ-সম্পদসহ যাবতীয় যোগ্যতা ব্যয় করেছে, এই লোকগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং নেক আমলসহ দ্বীনি আন্দোলন করেছে, আল্লাহর কোরআন এসব লোকদেরকে 'পবিত্র' হিসাবে চিত্রিত করেছে। আর যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে কদর্যতায় নিমজ্জিত থাকে, এদেরকে 'অপবিত্র' হিসাবে চিত্রিত করেছে। দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকগুলো এবং দ্বীনি আন্দোলন বিরোধী লোকগুলো এই পৃথিবীতে একই সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং ক্ষেত্র বিশেষে একই পরিবারে অবস্থান করে থাকে। কিয়ামতের দিন এই পবিত্র লোকগুলোকে অপবিত্র লোকদের থেকে পৃথক করা হবে এবং অপবিত্র লোকগুলোকে তথা অপরাধীদেরকে একত্রিত করে ঘেরাও অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সূরা আনফালের ৩৬-৩৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ–وَالَّذِيْنَ

كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ- لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ- اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

যেসব লোক পরম সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির কাজে ব্যয় করে, ভবিষ্যতে আরো ব্যয় করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব চেষ্টাই তাদের পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাজিত ও পরাভূত হবে, তারপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হবে। বস্তুত আল্লাহ অপবিত্রতাকে বেছে নিয়ে পৃথক করবেন এবং সব ধরনের অপবিত্রতাকে মিলিয়ে একত্রিত করবেন। অবশেষে এই সমষ্টিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মূলত এই লোকেরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

মানুষ যে পথে যে উদ্দেশ্যে নিজের যাবতীয় শ্রম, মেধা, অর্থ ও যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা নিয়োজিত করে, পরিণামে যখন জানতে পারে যে, সেই পথ তাকে সোজা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে–যে পথে সে তার যাবতীয় মূলধন ও যোগ্যতা নিয়োজিত করেছে। এ পথে সে কোনক্রমেই লাভবান হতে পারবে না বরং উল্টো তাকে মহাক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাহলে এই ধরনের ব্যক্তির তুলনায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত আর কে হতে পারে? বর্তমানে যারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে কৃত্রিতম সফলতা অর্জনের পথে যাবতীয় কিছু বিনিয়োগ করছে, তাদের অবস্থাও অনুরূপ। পরকাল হবে না এবং পৃথিবীর জীবনের কোন কর্মের হিসাব কারো কাছে কখনোই দিতে হবে না। এই চিন্তা-বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করেছেন, বৈধ-অবৈধের কোন সীমা এরা মানেনি। যে কোন পথে ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যয় করেছে, জীবন-যৌবনকে দ্বিধাহীন চিত্তে আকণ্ঠ ভোগ করেছে। এসব লোকই পরকালীন জীবনে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَاكَانُوْا مُهْتَدِيْنَ-

প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেসব লোকেরা, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ সম্ভাবনাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। (সূরা ইউনুস-৪৫)

ইসলামের দাওয়াত যারা গ্রহণ করবে না, কোরআন নির্দেশিত পথে আমলে সালেহ্ করবে না, পৃথিবী থেকে অনাচার-অবিচার দূর করার লক্ষ্যে কোরআনের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলন যারা করবে না, আল্লাহর দেয়া

বিধানকে যারা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক মনে করে এড়িয়ে চলবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। যারা আল্লাহর বিধানকে অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ, সেকেলে, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি অভিধায় অভিযুক্ত করে এবং মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করে এবং সেই আন্দোলনের প্রতি যারা সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়, তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا بِايتِ اللّهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخسِرِيْنَ–

আর তাদের মধ্যে তুমি শামিল হয়ো না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। অনথ্যায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস-৯৫)

পরকালকে মিথ্যা মনে করে এই পৃথিবীর জীবনকে যারা কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে নানা ধরনের পথ ও মত রচনা করেছে, ভোগ-বিলাসের নানা ধরনের উপকরণ তৈরী করেছে, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি, দল বা কোন বুযর্গকে বিশাল শক্তির অধিকারী মনে করে তার আনুগত্য করেছে, কিয়ামতের ময়দানে এসব কোন কিছুই তাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর দাসত্ব না করে যারা ভিন্ন কিছুর দাসত্ব করতো, তাদের সামনে মাথানত করতো, শক্তিমান লোকদের রচনা করা বিধান অনুসরণ করতো, কিয়ামতের দিন এসব কিছুই তাদের কাছ থেকে সটকে পড়বে। নিজের রচনা করা বিধান, দেব-দেবী ও কল্পিত শক্তির অধিকারী কোন কিছুরই অস্তিত্ব সেদিন থাকবে না। কিয়ামতের দিনে এসব লোকদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

أُولئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ لاَ جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الاخِرَةِ هُمُ الاَخْسَرُوْنَ–

এরা সেই লোক, যারা নিজেরাই নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আর তারা যা কিছু রচনা করেছিল, তার সবকিছু তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছে। অনিবার্যভাবে তারাই পরকালে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা হুদ-২১-২২)

আল্লাহর বিধান অনুসরণ করাকে যারা কঠিন মনে করেছে, রাসূলের আনুগত্য করাকে যারা কষ্টকর বলে চিন্তা করেছে, ইসলাম বিরোধী শক্তির দাপট দেখে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে, কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে হলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, অবৈধ ভোগ-বিলাস থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে হবে, সময়ের কোরবানী দিতে

হবে, অর্থ-সম্পদের কোরবানী দিতে হবে, ইসলাম বিরোধিদের কোপানলে পড়তে হবে, লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত হতে হবে, কারাগারের অন্ধকার জীবনকে মেনে নিতে হবে। এসব দিক চিন্তা করে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেয়নি, দ্বীনি আন্দোলনকে সাহায্য-সহযোগিতা করেনি, সমর্থন দেয়নি, সুবিধাবাদী দুনিয়া পুজারী এই গাফিল লোকগুলোও কিয়ামতের ময়দানে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আন্ নাহ্‌লে বলেন–

وَاُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ-لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ

এরা গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত, নিঃসন্দেহে আখিরাতে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দুনিয়া পূজারী ব্যক্তি ব্যর্থ হবে

মুসলিম পরিচয় দানকারী একশ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা নিজের মুসলিম পরিচয়ও বজায় রাখতে চায় এবং ভোগবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতিরও অনুসরণ করে। অর্থাৎ এরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে মোটেই রাজী নয়। অপরদিকে নিজেদের মুসলিম পরিচয় মুছে দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার সবটুকু গ্রহণ করতেও রাজী নয়। ইসলামের দুই একটি সহজ নিয়ম-নীতি ইচ্ছানুসারে অনুসরণ করবে এবং ভোগবাদী পশ্চিমা সভ্যতাও অনুসরণ করবে। এরা দুনিয়া পুজারী এবং এদের মানসিক গঠন অপরিপক্ক, এদের আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত নড়বড়ে, এরা প্রবৃত্তির পুজা করে। এসব লোক পার্থিব স্বার্থের কারণে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায়।

এদের ঈমানের সাথে এই শর্ত জড়িত যে, এদের যাবতীয় আশা-আকাংখা পূর্ণ হতে হবে, সব ধরনের নিশ্চিন্ততা অর্জিত হতে হবে, আল্লাহর দেয়া বিধান তাদের কাছে কোন ধরনের স্বার্থ ত্যাগ দাবী করতে পারবে না এবং পৃথিবীতে তাদের কোন ইচ্ছা ও আশা-আকাংখা অপূর্ণ থাকতে পারবে না। আল্লাহর বিধান যদি এদের মনের চিন্তা-চেতনা ও চ ওয়া-পাওয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে তাহলে ইসলাম তাদের কাছে সবথেকে ভালো আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু যখনই ইসলাম এদের অবৈধ কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে অগ্রসর হবে, তখনই এরা বলে উঠবে ইসলাম সেকেলে, পশ্চাৎপদ, প্রগতি বিরোধী, মৌলবাদ। আর মুসলিম হওয়ার কারণে যদি কখনো এদের ওপরে কোন আপন-বিপদ নিপতিত হয়, কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় অথবা এদের কোন আশা-আকাংখা পূরণের

পথে ইসলাম অর্গল তুলে দেয়, তাহলে এরা আল্লাহ তা'য়ালার সার্বভৌমত্বের কোন তোয়াক্কা করে না, রাসূলের রিসালাতের প্রতি ও কোরআনের সত্যতার প্রতি এরা সংশয়িত হয়ে পড়ে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি এদের বিশ্বাসের ভিত্তি কেঁপে ওঠে।

এই অবস্থায় দুনিয়া পুজারী এ লোকগুলো এসকল স্থানে মাথানত করে, এসব ঠুনকো শক্তির দাসত্ব করতে থাকে, যেখানে তাদের পার্থিব স্বার্থ জড়িত রয়েছে এবং তারা পার্থিব জীবনে লাভবান হতে পারবে। এসব লোকই হলো দ্বৈত-ইবাদাতকারী লোক। এদের আপদ-মস্তক শয়তানের গোলামীতে নিমজ্জিত থাকার পরও এরা নিজেদেরকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয় এবং মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য মাঝে মধ্যে ইসলামের কিছু নিয়ম-নীতি প্রদর্শনীমূলকভাবে পালন করে থাকে।

দ্বৈত-ইবাদাতকারী এসব নামধারী মুসলিমদের অবস্থা সব থেকে খারাপ। কাফির, মুরতাদ ও নাস্তিকরা নিজের রব-এর মুখাপেক্ষী না হয়ে এবং মন-মস্তিষ্ককে পরকালের ভীতিশূন্য করে ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে বস্তুগত স্বার্থের পেছনে ছুটতে থাকে তখন সে নিজের পরকাল বরবাদ করলেও পার্থিব স্বার্থ কিছু না কিছু অর্জন করে থাকে। অপরদিকে মু'মিন যখন পূর্ণ ধৈর্য, অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প সহকারে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে থাকে, তখন যদিও পার্থিব সাফল্য শেষ পর্যন্ত তার পদ-চুম্বন করেই থাকে, যদি পৃথিবীর স্বার্থ একেবারেই তার নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকে, তবুও আখিরাতে তার সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। পক্ষান্তরে দ্বৈত-ইবাদাতকারী মুসলমান নিজের পৃথিবীর স্বার্থও লাভ করতে সক্ষম হয় না এবং আখিরাতেও তার সাফল্যের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

তার মন-মস্তিষ্কের কোন এক প্রকোষ্ঠে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের অস্তিত্বের যে ধারণা রয়েছে এবং আল্লাহর বিধানের সাথে সম্পর্ক তার মধ্যে নৈতিক সীমারেখা কিছু না কিছু মেনে চলার যে ভাব-প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীর স্বার্থের পেছনে ছুটতে থাকলেও এগুলো তাকে পেছন থেকে টেনে ধরে। ফলে নিছক বস্তুগত স্বার্থ ও বৈষয়িক স্বার্থ অন্বেষার জন্য যে ধরনের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার প্রয়োজন তা একজন কাফির-নাস্তিক ও পরকালের ভীতিহীন লোকদের মতো তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না– এটা বাস্তব সত্য।

আখিরাতের কথা চিন্তা করলে পৃথিবীর লাভ ও স্বার্থের লোভ, ক্ষতির ভয় এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বিধি-নিষেধের শৃংখলে বেঁধে রাখার ব্যাপারে মানসিক অস্বীকৃতি সেদিকে যেতে দেয় না বরং বৈষয়িক স্বার্থ পূজা তার বিশ্বাস ও কর্মকে এমনভাবে বিকৃত করে দেয় যে, আখিরাতে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে এসব দ্বৈত-ইবাদাতকারী লোকগুলো পৃথিবী ও আখিরাত-দুটোই হারিয়ে মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ এসব লোকদের সম্পর্কে বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ-فَاِنْ اَصَابَه خَيْرُ نِ اطْمَاَنَّ بِه- وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِه-خَسِرَ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةَ-ذٰلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ-

আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ রয়েছে, যে এক প্রান্তে অবস্থান করে আল্লাহর দাসত্ব করে, যদি তাতে তার উপকার হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় আর যদি কোন বিপদ আসে তাহলে পেছনের দিকে ফিরে যায়। তার দুনিয়াও গেলো এবং আখিরাতও। আর এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা হজ্জ-১১)

মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে কারা

আল্লাহর নাযিল করা জীবন বিধান ব্যতীত পৃথিবীতে প্রচলিত ও আবিষ্কৃত যত মত ও পথ রয়েছে, নিয়ম-নীতি, প্রথা, আইন-কানুন রয়েছে তা সবই বাতিল। এই বাতিল মতাদর্শ-মতবাদ যারা অনুসরণ করবে, তারাই মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আনকাবুতের ৫২ নং আয়াতে বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ-اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرِيْنَ-

যারা বাতিলকে মানে ও আল্লাহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

মানব রচিত মতবাদ মতাদর্শের অনুসারীরা মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিধানকে মসজিদ-মাদ্রাসার চার দেয়ালে আবদ্ধ রাখতে চায়। মানব জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন–পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অঙ্গনে আল্লাহর বিধানের পদচারণা বরদাশ্ত করতে এরা রাজী নয়। আল্লাহ তা'য়ালাকে এরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকৃতি দিতে চায় না। এরা বলে থাকে, দেশের জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এরাই হলো বাতিল পথ ও মতের

অনুসারী এবং এরা হাশরের ময়দানে মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ-

যমীন এবং আসমানের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আর যেদিন কিয়ামতের সময় এসে উপস্থিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা জাসিয়া-২৭)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধু এই পৃথিবীই সৃষ্টি করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে রয়েছে, তাঁর প্রতিপালনের কারণেই বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কল্যাণের তা সক্রিয় রয়েছে। সুতরাং একমাত্র সেই আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে এবং যাবতীয় ব্যাপারে তাঁরই মুখাপেক্ষী হতে হবে।

দ্বৈত-ইবাদাতকারী লোকগুলো পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা, শক্তি ও ধন-সম্পদের আশায় অন্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য ধর্ণা দেয়। এই ধরনের অবস্থা যাদের তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা যাবতীয় কিছু দেয়ার মালিক তিনি এবং সমস্ত কিছুর চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন–

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। যমীন ও আসমানের ভান্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (সূরা যুমার-৬৩)

উল্লেখিত আয়াতে 'আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে' এ কথার অর্থ হলো মহান আল্লাহকে সর্বশক্তির অধিকারী মনে না করা। অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে যে, একমাত্র তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। একমাত্র তিনিই ধনীকে নির্ধন ও গরীবকে ধনী বানিয়ে দিতে পারেন। যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে তিনিই হেফাজত করতে পারেন এবং মনের আশা-আকাংখা তিনিই বাস্তবায়ন করতে পারেন। তিনিই একমাত্র দোয়া কবুলকারী। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা সাহায্যের আশায় মাজার আর দরগায় গিয়ে ধর্ণা দেয়, তারাই আল্লাহর আয়াতের

সাথে অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের সাথে কুফরী করে এবং এরাও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সাহায্যকারী, আশা পূরণকারী, দোয়া কবুলকারী, ধন-সম্পদ দানকারী, রোগ থেকে আরোগ্যকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ইত্যাদী মনে করা হয়, তাহলে তা হবে সুস্পষ্ট শিরক।

একশ্রেণীর মানুষ দরগাহ, মাজার ও একশ্রেণীর পীরদেরকে এসব গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাদের কাছে সাহায্য কামনা করতে থাকে এবং মনে মনে ধারণা পোষণ করে যে, তারা নেক কাজ করছে। কোরআনের ভাষায় এসবই হলো শিরক। এদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হাশরের ময়দানে এসব লোকদের আমলনামা ধূলার মতোই উড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَقَدْ أُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ-لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

তোমার কাছে এবং ইতোপূর্বেকার সমস্ত নবীর কাছে এই ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও তাহলে তোমার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। (সূরা যুমার-৬৫)

মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবার মূল কারণ

প্রত্যেক নবী-রাসূলই পরকালে আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহির কথা বলেছেন এবং মানুষের মনে পরকালের ভীতি সঞ্চার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তার সিংহভাগ জুড়ে থেকেছে পরকাল সম্পর্কিত আলোচনা। সর্বশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মানব জাতির জন্য যে সর্বশেষ জীবন বিধান-আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভেতরেও পরকালের বিষয়টিই সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে।

গোটা ত্রিশপারা কোরআনে পরকাল সম্পর্কিত যে আলোচনা এসেছে, তা একত্রিত করলে প্রায় দশ পারার সমান হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বিশাল আলোচনা কেন করা হয়েছে? আমরা তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে এবং আমপারার তাফসীরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে বিষয়টি এভাবে পেশ করছি যে, পরকালে জবাবদিহির ভীতি

ব্যতীত কোনক্রমেই মানুষের মন-মস্তিষ্ক অপরাধের চেতনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সর্বাধিক কঠোর আইন প্রয়োগ করেও মানুষকে অপরাধ মুক্ত সৎ জীবনের অধিকারী বানানো যায় না। কারণ অপরাধীর প্রতি শাস্তির দন্ড প্রয়োগ করতে হলে প্রয়োজন হবে সাক্ষ্য প্রমাণের। পক্ষান্তরে যে অপরাধী কোন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ না রেখে অপরাধমূলক কর্ম সম্পাদন করে, সে থাকে আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এবং তার প্রতি পৃথিবীতে দন্ডও প্রয়োগ করা যায় না।

সুতরাং পৃথিবীতে এমন কোন আইন-কানুনের অস্তিত্ব নেই, যে আইন মানুষকে নির্জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে একাকী অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। এই অবস্থায় মানুষকে অপরাধ থেকে মুক্ত রাখতে পারে কেবল পরকাল ভীতি তথা আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির অনুভূতি। এ কারণেই মানব মন্ডলীর জন্য প্রেরিত সর্বশেষ জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কোরআনে পরকালের বিষয়টি সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে।

অপরদিকে প্রত্যেক যুগেই একশ্রেণীর মানুষ পরকালের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করেছে এবং পরকালের স্বপক্ষে যারা কথা বলেছে, তাদের বিরোধিতা করেছে। এই শ্রেণীর লোকগুলো কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করতে চায়নি যে, মৃত্যুর পরে মানুষ পুনরায় পুনর্জীবন লাভ করবে এবং আল্লাহর আদালতে যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করতে হবে। এই শ্রেণীর মানুষদের একজন স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তাঁর গুণাবলী ও পরিচয় সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট।

এ জন্য তারা কোনভাবেই মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনকে বিশ্বাস করতে চায়নি। মৃত্যুর পরে মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি, চর্ম, গোস্ত এবং প্রতিটি অণু-পরমাণু ধ্বংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। মাটি সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলে। এরপরে কিভাবে পূর্বের ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ জীবন লাভ করবে? এই বিষয়টি হলো পরকাল সম্পর্কে সংশয়িত লোকদের চিন্তা-চেতনার অতীত।

প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীরা যখন পরকালের কথা বলে মানুষের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেছেন এবং মানুষের ভেতরে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন, তখন পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী লোকগুলো নবী-রাসূলদেরকে পাগল হিসাবে চিহ্নিত করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। পরকাল সম্পর্কে কোন মতবাদ তারা গ্রহণ করতে চায়নি বরং পরকাল বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতিত করেছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, যারা পরকালে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির কথা বলেছে, তাদের

প্রতি একশ্রেণীর মানুষ কেন মারমুখী আচরণ করেছে এবং কেনই বা তাদেরকে নির্যাতন করেছে? পরকাল বিরোধিদের এমন কি ক্ষতি হচ্ছিলো যে, তারা পরকাল বিশ্বাসীদেরকে বরদাশ্‌ত করেনি?

আসলে পরকাল বিরোধিতার পেছনে এক মনস্তাত্বিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সেই কারণ হলো, যেসব লোক পরকালে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে–এ কথা বিশ্বাস করে, তাদের চরিত্র, আচার-আচরণ, মননশীলতা ও রুচি, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি হয় এক ধরনের। আর পরকাল অবিশ্বাসীদের উল্লেখিত যাবতীয় বিষয় হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, এ কথা আবহমান কাল থেকে পৃথিবীতে সত্য বলেই প্রমাণিত হয়ে আসছে।

যে ব্যক্তি পরকাল বিশ্বাস করে, তার এমন এক মন-মানসিকতা গড়ে ওঠে যে, সে প্রতিটি মুহূর্তে অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত রাখে যে, তার প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য কর্মকান্ড রেকর্ড হচ্ছে এবং মৃত্যুর পরের জগতে এ সম্পর্কে তাকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। মহান স্রষ্টা তার ওপরে যে প্রহরী নিযুক্ত করেছেন, তার দৃষ্টি থেকে কোন কিছুই গোপন করা যাবে না। সে যদি কোন অপরাধমূলক কর্ম করে থাকে তাহলে এর জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে–এ বিশ্বাস তার ভেতরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলেই সে যে কোন ধরনের অপরাধমূলক কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

আর যারা পরকাল অবিশ্বাস করে অথবা পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, তাদের চরিত্র হয় পরকাল বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, পরকাল বলে কিছুই নেই সুতরাং তাদের কোন কর্মের ব্যাপারে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। পৃথিবীর জীবনে তারা যদি অবৈধভাবে জীবন-যৌবনকে ভোগ করে, অপরের অধিকার খর্ব করে অর্থ-সম্পদের স্তুপ গড়ে, দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের জন্য দেশ ও জাতির ক্ষতি করে, জাতীয় সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে, ক্ষমতার বলে অধীনস্থদের অপরাধমূলক কর্মে জড়িত হতে বাধ্য করে, স্বৈরাচারী নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে দেশের জনগণের কণ্ঠরোধ করে, সাধারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে তাদেরকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করে–তবুও তারা ভয়ের কোন কারণ অনুভব করে না। কারণ তারা এ বিশ্বাসে অটল যে, মৃত্যুর পরে তাদের এসব হীন কর্মের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

কারণ পরকাল বিশ্বাস করলেই নিজের প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিতে হবে, যে কোন ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃংখলতা বন্ধ করতে হবে, অন্যায় ও অবৈধ পথে নিজের জীবন-যৌবনকে ভোগ করা যাবে না, অন্যায় পথে অর্থ-সম্পদের স্তুপ গড়া যাবে না, ক্ষমতার মসনদে বসে দেশ ও জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, নিজের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল করতে হবে, নির্দিষ্ট একটি গন্ডির ভেতরে নিজেকে পরিচালিত করতে হবে। আর এসব করলে তো জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করা যাবে না। পরকালের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণের পেছনে এটাই হলো মনস্তাত্বিক কারণ।

এই ধরনের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতা গঠিত হয় পরকাল অবিশ্বাস করার কারণে। নৈতিকতা, ন্যায়-পরায়ণতা, সুবিচার, দুর্বল, নির্যাতিত-নিপীড়িত ও উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতি, দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন ইত্যাদি সৎ গুণাবলীতে তারা বিশ্বাসী নয়। অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, অনাচার, হত্যা-সন্ত্রাস, অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা এদের কাছে কোন অপরাধ বা নৈতিকতার লংঘন বলে বিবেচিত হয় না। নিজের যৌন কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নারী জাতিকে এরা ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে। ব্যক্তি স্বার্থ, জাতিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য একটি মানুষকেই শুধু নয়, গোটা একটি দেশ বা জাতিকে নিজেদের গোলামে পরিণত করতে বা ধ্বংস করে দিতেই এরা কুণ্ঠাবোধ করে না। পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সাক্ষী, এই পৃথিবীর বুকে এমন বহু জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করার পরও পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকার কারণে তারা নিমজ্জিত হয়েছে নৈতিক অধঃপতনের অতল তলদেশে।

পরকাল অবিশ্বাসের কারণে তারা নৈতিক অধঃপতনের অন্ধকার বিবরে প্রবেশ করে ন্যায়ের শেষ সীমা যখন অতিক্রম করেছে, তখনই তারা আল্লাহ তা'য়ালার গযবে নিপতিত এই পৃথিবী থেকে এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যে, তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গিয়েছে। অধিকাংশ মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবার এটাই হলো মূল কারণ যে, তাদের অন্তরে পরকালের প্রতি বিশ্বাস নেই। পরকাল বিশ্বাস অন্যায়কারীর কণ্ঠে জিঞ্জির পরিয়ে দেয়, ফলে সে অন্যায় পথে অগ্রসর হতে পারে বিধায় অন্যায় পথ অবলম্বনকারীরা নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদেরকে করেছে অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্ত এবং আঘাতে আঘাতে তাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে, নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছে, ফাঁসির

রশি তাদের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়েছে এবং বর্তমানেও তাদের উত্তরসূরিদের আচরণে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এই শ্রেণীর লোক পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে তাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত, সুশৃংখল এবং উদগ্র কামনা-বাসনাকে দমন করতে অতীতে যেমন রাজী ছিল না বর্তমানেও রাজী নয়। নিজ দেশের জনগণ বা ভিন্ন দেশের জনগণকে নিজেদের গোলামে পরিণত করে তাদের ওপরে প্রভুত্ব করার কলুষিত কামনাকে এরা নিবৃত্ত করতে আগ্রহী নয়। নিজের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও পরকালের প্রতি যথার্থ বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই হলো মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবার মূল কারণ। এদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ-اُولٰئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

প্রকৃত বিষয় এই যে, যারা আমার সাথে আখিরাতে মিলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পায় না এবং পৃথিবীর জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনগুলোর প্রতি উদাসীন থাকে, তাদের শেষ আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, ঐসব কৃতকার্যের বিনিময়ে যা তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি অনুসারে করেছে। (সূরা ইউনুস-৭-৮)

এসব লোক পৃথিবীর জীবন নিয়েই নিশ্চিন্ত থেকেছে এবং কখনো এ চিন্তা তাদের মনে উদয় হয়নি যে, তাদের একজন স্রষ্টা এবং প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি তাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিপালন করছেন এবং যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে যাচ্ছেন। সেই আল্লাহ তা'য়ালা যে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড দেখছেন এবং তাঁর কাছে সমস্ত কিছুর হিসাব দিতে হবে, এই বিশ্বাস তাদের নেই। এ কথা তারা বিশ্বাস করে না যে, এমন একটি সময় আসবে, সে সময়ে তাদের নিজেদের দেহের চামড়া, চোখ, কান, হাত-পা ইত্যাদি স্বয়ং তারই বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবে। এই বিশ্বাস না থাকার কারণেই তারা পৃথিবীতে যা খুশী করছে এবং মারাত্মক ক্ষতির দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে। সূরা হামীম সিজদায় বলা হচ্ছে আখিরাতের দিন এসব ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের বলা হবে-

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ

اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ-وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ-

পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় যখন তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোন সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের সংবাদ আল্লাহও রাখেন না। তোমাদের এই ধারণা–যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে করেছিলে–তোমাদের সর্বনাশ করেছে এবং এর বিনিময়েই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো।

পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী ও অবিশ্বাসী লোকগুলো এই পৃথিবীতে আপাদ-মস্তক নোংরামীতে নিমজ্জিত থেকেছে, নিজের দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্যায় কাজে ব্যবহার করেছে কিন্তু নিজের অজান্তেও এ কথা তারা কল্পনা করেনি যে, তার দেহের যে অঙ্গগুলোর প্রতি সে এত যত্নশীল এবং এসব অঙ্গের শোভাবর্ধন করার লক্ষ্যে সে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, এসব অঙ্গ-ই একদিন তার বিরুদ্ধে তার অন্যায় কাজের সাক্ষী দেবে। এসব লোক বিশ্বাস করেছে স্রষ্টা বলে কেউ নেই এবং কোন কর্মের হিসাবও কারো কাছে দিতে হবে না, তাদের এই বিশ্বাসই তাদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে হাশরের ময়দানে।

ভ্রান্ত এই বিশ্বাস অনুসারে এসব লোক পৃথিবীতে নিজের জীবন পরিচালিত করেছে এবং নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, প্রভাবাধীন আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় লোকজন এবং নিজের অধীনস্থদের পরিচালিত করে তাদেরকেও মহাক্ষতির দিকে নিক্ষেপ করেছে। কিয়ামতের দিন এসব লোকদেরকে যখন গ্রেফতার করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকগুলো ঐ লোকগুলো সম্পর্কে বলবে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

যারা ঈমান এনেছিলো সেই সময় তারা বলবে, প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। (সূরা শূরা-৪৫)

ঐ শ্রেণীর মানুষগুলোই সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে পৃথিবীতে যাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং এরা মনে করতো, তারা যা করছে তা সঠিক কাজই করছে। এরা লেখা-পড়া করেছে, বিদ্যা অর্জন করেছে, সমাজ কল্যাণমূলক কোন কাজ করেছে, রাজনীতি করেছে, আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, মিছিল-মিটিং ধর্মঘটসহ যা কিছুই করেছে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে করেছে। কারণ এরা ভেবেছে এই পৃথিবীর জীবনই আসল জীবন, মৃত্যুর পরে কোন জীবন নেই। সুতরাং কারো কাছে নিজের কাজের কোন হিসাব দিতে হবে না। এসব লোক পৃথিবীর জীবনে সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে।

এই শ্রেণীর লোকগুলো মহান আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও সেই আল্লাহ কোন্ কাজে সন্তুষ্ট হবেন এবং কোন্ কাজে অসন্তুষ্ট হবেন, তাঁর সামনে গিয়ে একদিন উপস্থিত হতে হবে এবং নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, এ চিন্তা তারা কখনো করেনি। পক্ষান্তরে এসব লোকগুলো পৃথিবীতে নিজেদেরকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করতো। তারা ধারণা করতো, তারা যা করছে–তা অবশ্যই সঠিক পথেই পরিচালিত হচ্ছে। দেশ ও জনগণের কল্যাণের দোহাই দিয়ে আন্দোলন মিছিল-মিটিং, হরতাল করছে, সন্ত্রাস করে দেশ ও জনগণের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি করছে, দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে, তবুও এরা জোর গলায় প্রচার করছে, তারা যা কিছুই করছে তা মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যেই করছে। এসব লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً–اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا–

হে রাসূল! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই, যাদের পৃথিবীর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক পথেই করে যাচ্ছে। (সূরা কাহ্ফ-১০৩-১০৪)

আমলে সালেহ্ ও নিয়্যতের বিশুদ্ধতা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকাই হলো আমলে সালেহ। সুতরাং কোন্ ধরনের কর্ম আমলে সালেহ্ এবং কোন্ ধরনের কর্ম আমলে গায়ের সালেহ, এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। সফলতা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ঈমান আনতে হবে এবং ঈমানকে যদি গণিত শাস্ত্রের (এক-এর) ১–এর সাথে তুলনা করা যায় তাহলে আমলে সালেহ্কে (শূন্য-এর) ০–এর সাথে তুলনা করতে হয়। ১–এই অঙ্কটির সাথে একটি ০–জুড়ে দিলে হবে ১০ এবং আরেকটি ০–জুড়ে দিলে হবে একশত। এভাবে একটির পরে আরেকটি ০–জুড়ে দিতে থাকলে ঐ প্রথম ১–এর মান ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। অনুরূপভাবে ঈমান আনার পরে একটির পর আরেকটি আমলে সালেহ্ করতে থাকলে ঈমান বৃদ্ধি পেতে থাকবে অর্থাৎ ঈমান শক্তিশালী-মজবুত হবে।

১–এর সাথে ০–জুড়ে দিলেই ঐ ১–এর মান বৃদ্ধি পাবে না। ০–জুড়তে হবে ১–এর ডান দিকে। ডান দিকে ০–জুড়ে না দিয়ে বাম দিকে যতগুলোই ০–জুড়ে দেয়া হোক না কোনো, ঐ প্রথম ১–এর মান ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকবে। ঐ ১–এর কোনো মূল্যই থাকবে না। অর্থাৎ আমলে সালেহ্ করতে হবে ঈমানের সাথে। আর ডান পাশে ০–জুড়ে না দিয়ে যদি বাম পাশে দেয়া হয়, তাহলে ঐ ১–এর কোনো মূল্য থাকবে না। অর্থাৎ বামপন্থী যারা, মহান আল্লাহর দরবারে তাদের কোনো ধরনের কর্মকান্ড গ্রহণ যোগ্য হবে না। আল্লাহর দরবারে সফলতা অর্জন করবে কেবলমাত্র ডানপন্থী লোকেরা। পৃথিবীতে ডানপন্থী বলতে যাদেরকেই বুঝানো হোক না কোনো, আল্লাহর কোরআনে ডানপন্থী (আস্হাবুল ইয়ামিন) বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা মহান আল্লাহর বিধানের অনুসারী। আর বামপন্থী (আস্হাবুশ্ শিমাল) বলতে কোরআনের তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা মানুষের বানানো আদর্শ তথা শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ-মতাদর্শের অনুসারী।

বামপন্থীরা হলো কাফির এবং এদের নেতা হলো স্বয়ং শয়তান, মৃত্যুর পরের জগতে তারা শয়তানের নেতৃত্বেই জান্নামে প্রবেশ করবে। সূরা ওয়াকেয়াতে বলা হয়েছে, এই বামপন্থীরা কিয়ামতের ময়দানে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে। বামপন্থীরা শয়তান কর্তৃক প্রভাবিত, শয়তান এদেরকে মহান আল্লাহর পথ থেকে গাফিল করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ-اَلاَ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ-

শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসেছে এবং সে তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দলভুক্ত লোক। জেনে রাখো, শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুজাদালা-১৯)

আর ডানপন্থীরা হলো মহান আল্লাহর মুমিন বান্দাহ্ আর তাদের নেতা হলো নবী ও রাসূলগণ। আদালতে আখিরাতে ডানপন্থীরা নবী-রাসূলদের নেতৃত্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সূরা ওয়াকেয়ায় ডানপন্থীদের সৌভাগ্যের কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ডানপন্থীরাই হলো ঈমানদার এবং এদের আমলে সালেহ্ মহান আল্লাহ কবুল করবেন। এদের প্রতি মহান আল্লাহও সন্তুষ্ট এবং এরাও আল্লাহর তা'য়ালার প্রতি সন্তুষ্ট। সূরা মুজাদালায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط اُوْلٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلاَ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহর প্রতি। এরা আল্লাহর দলভুক্ত লোক। জেনে রেখো, আল্লাহর দলভুক্ত লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।

সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে দুটো শর্ত

সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে আমলে সালেহ করা একান্ত জরুরী এবং আমলে সালেহ্ করার ব্যাপারে দুটো শর্ত রয়েছে। এর প্রথম শর্ত হলো, আমলে সালেহ্ হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। আর দ্বিতীয় শর্ত হলো, আমলে সালেহ্ হতে হবে সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পন্থানুসারে। অর্থাৎ যেভাবে মহান আল্লাহর রাসূল আমলে সালেহ্ করেছেন, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম করেছেন, সেইভাবে আমলে সালেহ্ করতে হবে।

যে কোনো সৎকাজই করতে হবে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। নিয়্যত হবে হবে সহীহ-শুদ্ধ। সৎকাজ কবুল হওয়ার প্রথম শর্তই হলো নিয়্যতের বিশুদ্ধতা। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সমস্ত কাজই নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল।' এটা একটি বড় হাদীসের ক্ষুদ্র অংশ এবং হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইসলামী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু

আনহু। এটি বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস এবং মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খন্ডে কিতাবুল জিহাদ, আবু দাউদ শরীফে তালাক অধ্যায়ে, ইবনে মাজাহ্ শরীফে জুহূদ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুসনাদে আহ্মাদ, দারেকুতনী, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকী প্রমুখও হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অতএব সৎকাজের বা আমলে সালেহ্র পেছনে নিয়্যত থাকতে হবে মহান আল্লাহকে খুশী করা। আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ব্যতীত ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ করলে আল্লাহর দরবারে তা গৃহীত হবে না। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ–

বলো, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সমস্ত কিছুই আল্লাহর জন্য নিবেদিত যিনি সারা সৃষ্টিলোকের রব। (সূরা আনআ'ম)

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে। এসবের ভেতরে যদি প্রদর্শনীমূলক মনোভাব থেকে থাকে যে, নামায-রোজা আদায় করলে সমাজের লোকজন ভালো বলবে এবং নির্বাচনের সময় লোকজন তাকেই সমর্থন করবে। হজ্জ করলে লোকেরা নামের পূর্বে 'হাজী' শব্দ সহযোগে সম্বোধন করবে, দান-খয়রাত করলে লোকজন 'দানবীর' উপাধিতে ভূষিত করবে, এই যদি নিয়্যত হয়, তাহলে আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না। কাজগুলো নিঃসন্দেহে আমলে সালেহ্–কিন্তু তা সম্পাদন করা হয়েছে বৈষয়িক উদ্দেশ্যে, এসব মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিবেদিত ছিল না। কিয়ামতের দিন এসব লোকদেরকে বলা হবে, পৃথিবীতে তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসব কাজ করেছিলে, তার বিনিময় পৃথিবীতে দেয়া হয়েছে। লোকজন তোমাদেরকে পরহেজগার, হাজী সাহেব, দানবীর, মহৎ, মহানুভব ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছে, সমাজের লোকজন তোমাদেরকে সমর্থন করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে আমলে সালেহ্ করেছিলে, পৃথিবীতে তার বিনিময় লাভ করেছো, আজকের দিনে তোমাদের আর কিছুই পাওনা নেই। আজকের দিনে কেবলমাত্র তারাই বিনিময় লাভ করবে, যারা একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমলে সালেহ্ করেছে।

একশ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা ব্যাপক প্রচার করে তারপর যাকাতের নামে বস্ত্র বিতরণ করে থাকে। নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থ-সম্পদ দান

করে। এসবের পেছনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য থাকে না। ঐসব প্রতিষ্ঠান থেকে পত্র-পত্রিকা, স্মরণিকা প্রকাশ হবে, তাতে তার নাম উল্লেখ থাকবে, প্রতিষ্ঠানে দানকারীদের নামের যে তালিকা থাকবে, তাতে তার নাম উল্লেখ থাকবে, লোকজন তার দানের ভূয়সী প্রশংসা করবে, এই উদ্দেশ্যেই দান করে থাকে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, রাস্তা-পথ ইত্যাদি নির্মাণ করে দিয়ে তার নামকরণ করা হয় নিজের নামে। এর পেছনে উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে নিজের কীর্তি ও নামকে অক্ষয়-অমর করা। এদের এসব কাজ নিঃসন্দেহে আমলে সালেহ্ কিন্তু এর পেছনের উদ্দেশ্য সৎ নয়। এদের এসব সৎকাজ কিভাবে বরবাদ হবে, মহান আল্লাহ শোনাচ্ছেন–

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِى هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ-وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-

তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে, তা সেই প্রবল বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে 'শৈত্য' রয়েছে এবং তা যে-জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের শস্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং একে একেবারে বরবাদ করে দেয়। (সূরা ইমরান-১১৭)

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, এই পৃথিবী হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত স্বরূপ, এখানে যা বপন করা হবে, আখিরাতে তার ফসল লাভ করবে। উল্লেখিত আয়াতে 'শস্যক্ষেতের' যে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, সেই 'শস্যক্ষেত' বলতে মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকে বুঝানো হয়েছে, যার বিনিময় মানুষ আখিরাতে লাভ করবে। আয়াতে 'প্রবল বাতাস' দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই বাহ্যিক ও স্থূল কল্যাণ-স্পৃহাকে যার দরুণ দুনিয়া পূজারি লোকজন জনকল্যাণ ও সাধারণ উপকারের কাজকর্মে অর্থ ব্যয় করে থাকে। আয়াতে উল্লেখিত 'শৈত্য বা শীত' অর্থ প্রকৃত ঈমান এবং আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভাব বুঝানো হয়েছে, যার ফলে তাদের গোটা জীবনকাল একেবারে ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছে।

এই উপমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, বাতাস শস্য ক্ষেতের জন্য উপকারী এবং তা শস্য উৎপাদনে সহায়ক। কিন্তু এই বাতাসই যদি 'তীব্র শৈত্য প্রবাহ' হয়, তাহলে তা শস্য ক্ষেতের উপকার ও উৎপাদন বৃদ্ধির

সহায়ক না হয়ে চরম ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। বাতাস যদি শস্যের পক্ষে সহনশীল না হয়ে ক্ষতিকর হয়, তাহলে শস্য উৎপাদিত হবে না। ঠিক একইভাবে জনকল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিবির স্থাপন করে জনগণের সেবা-যত্ন করা, চিকিৎসা প্রদান করা বা অন্য কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করার কাজও মানুষের পরকালের ক্ষেতকে লালন–পালন ও শক্তি দান করে, একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এসব কাজের পেছনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য যদি না থাকে, তাহলে এসব মহান কাজ কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে আখিরাতের ময়দানে প্রমাণিত হবে।

আখিরাতে যেসব সৎ কাজের বিনিময় দেয়া হবে না

এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মানুষের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আর মানুষের ধন-সম্পদের মালিকও তিনি–যদিও এসব ধন-সম্পদ মানুষই ব্যবহার করে থাকে। অনুরূপভাবে এই মহাবিশ্ব, রাষ্ট্র, রাজত্ব ও রাজ্যেরও একচ্ছত্র প্রভু হলেন আল্লাহ তা'য়ালা, যদিও মানুষই এর মধ্যে বসবাস করে। এখন আল্লাহর কোনো বান্দাহ্ যদি তার প্রকৃত মালিকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার না করে, অথবা তাঁর দাসত্ব করার সাথে সাথে অন্য কারো অসংগত দাসত্ব করে এবং আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ ব্যবহার ও তাঁর রাজ্য-সাম্রাজ্যে জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে একমাত্র তাঁরই আইন-কানুন অনুসরণ না করে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে না করে, তাহলে তার গোটা জীবনকালে সম্পাদিত যাবতীয় সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ একটি বিরাট অপরাধের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এসব কাজের কোনো সওয়াব বা বিনিময় আখিরাতে পাওয়া তো দূরের কথা, গোনাহের বোঝা মাথা নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে।

মহান আল্লাহর কাছে মানুষের চেষ্টা ও কর্মের বিনিময় লাভ করা নির্ভর করে দুটো জিনিসের ওপর। প্রথম হলো, মানুষের সমস্ত চেষ্টা-সংগ্রাম ও কর্ম-সাধনা হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে। আর দ্বিতীয়টি হলো, এই চেষ্টা-সংগ্রাম ও কর্ম-প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে পৃথিবীর পরিবর্তে আখিরাতের সাফল্যই হতে হবে প্রধান ও চরমতম লক্ষ্য। যেসব সৎকাজে এ দুটো শর্ত পূরণ করা হবে না, সেখানে সমস্ত সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ বরবাদ হয়ে যাবে। সূরা আল আ'রাফের ১৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ط هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

আমার নিদর্শনসমূহকে যে কেউ মিথ্যা মনে করবে এবং পরকালের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। লোকেরা যেমন করবে, তেমন ফলই পাবে, এটা ছাড়া আর কি প্রতিফল পেতে পারে?

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করে, কোরআনের হেদায়াত অনুসরণ না করে, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বা আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহাত্মক নীতিতে পৃথিবীতে যতো সৎকাজই করা হোক না কেনো, এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কোনো ধরনের ফল লাভ করার আশা পোষণ করা যায় না বা এই আশা পোষণ করার কোনো অধিকারই থাকে না। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র পৃথিবীতে স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই সৎকাজ করলো, পরকালে এসব কাজের কোনো বিনিময় পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ–اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ النَّارُ–وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ–

যেসব লোক শুধু এই পৃথিবীর জীবন এবং এর চাকচিক্যের অনুসন্ধানী হয়, তাদের কাজ-কর্মের যাবতীয় ফল আমি এখানেই তাদেরকে দান করি আর সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোনরূপ কম করা হয় না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ব্যতীত আর কিছুই নেই। (সেখানে তারা জানতে পারবে যে) তারা পৃথিবীতে যা কিছুই বানিয়েছে, তা সবই বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়েছে। (সূরা হূদ-১৫-১৬)

পৃথিবীতে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, নিজের রব মহান আল্লাহর বিধানের কোনো পরোয়া যারা করে না, মৃত্যুর পরে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে, এ বিষয়টির প্রতি যারা সন্দেহ-সংশয়ের আবর্তে দোলায়িত হয় বা অবহেলা প্রদর্শন করে, অথবা অস্বীকার করে, বৈধ-অবৈধ তথা উপার্জনের ব্যাপারে কোনো সীমারেখা মানে না, এই শ্রেণীর লোকগুলোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ-বিত্তের

ও ধন-সম্পদের অধিকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মান, মর্যাদাকর পদসমূহ এই শ্রেণীর লোকদের অধিকারে থাকে। এরাই দেশের বুকে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। পৃথিবীর আরাম-আয়েশ এদের দখলে, ভোগ-বিলাসে এদের জীবন অতিবাহিত হয়। সর্বত্র এদেরকেই গুরুত্ব ও সম্মান দেয়া হয় এবং সাধারণ মানুষও এদেরকেই বরণ করে। গাড়ি-বাড়ি ও ইন্ডাষ্ট্রী–কোনো কিছুরই অভাব এদের থাকে না।

দান-দক্ষিণার ক্ষেত্রেও এরাই অগ্রগামী। এরা জনকল্যাণমূলক কাজ করে কিন্তু তাদের এসব কাজের ফলাফল পরকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে না। কারণ তাদের কর্মকান্ড পরকাল অর্জনের জন্য ছিল না। পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা, নাম-যশ ইত্যাদি অর্জন ছিল এসব কাজের উদ্দেশ্য। এরাও দুনিয়া কামনা করে, মহান আল্লাহও তাদের যাবতীয় কাজ-কর্মের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। যে উদ্দেশ্যে কর্ম পরিচালিত হয়, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল করে দেন এবং দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কোনোরূপ কৃপণতা করেন না। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার লক্ষ্যে নির্বাচক মন্ডলীর কল্যাণে রাস্তা-পথ নির্মাণ করে দেয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেয়, নগদ অর্থ বন্টন করে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেয়, বস্ত্রের অভাব পূরণ করে। এসবই করে নির্বাচনের সময়ে সমর্থন লাভের আশায়।

এসব সৎকাজ কেউ করে গুণ-কীর্তন ও প্রশংসা লাভের আশায়। আল্লাহ তা'য়ালা এসব কাজের বিনিময় এই পৃথিবীতে দিয়ে দেন। সাধারণ লোকজনের সমর্থন তারা লাভ করে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে। অথবা তারা প্রশংসা লাভ করে, লোকজন তাদের গুণ-কীর্তন করতে থাকে। মৃত্যুর পর প্রশংসা করে তাদের জীবনী রচিত হয়, তাদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা রাস্তা-পথের নামকরণ তাদের নামে করা হয়। তাকে উপলক্ষ্য করে প্রশংসামূলক গীত-কবিতা, সাহিত্য রচিত হয়, পত্র-পত্রিকা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। সুতরাং তাদের যা কাম্য ছিল, আল্লাহ পৃথিবীতেই তা দিয়ে দেন।

কিন্তু পরকালে তারা দেখতে পাবে, পৃথিবীতে তারা যতো সৎকাজ করে এসেছে, তা সবই ব্যর্থ হয়েছে ও নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন ব্যতীত অন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে সূরা কাহ্‌ফ-এর ১০৩-১০৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً-اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِايٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا-

হে রাসূল! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই, যাদের পৃথিবীর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক পথেই করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রব-এর নিদর্শনাবলী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হবার বিষয়টি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হবে না।

অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকজন যেসব আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজ করেছে তা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনে করেছে, মহান আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন ও আখিরাতের চিন্তা না করেই শুধুমাত্র পৃথিবীতে স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে করেছে। পৃথিবীর জীবনকেই তারা প্রকৃত জীবন মনে করে করেছে। পৃথিবীর সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে। আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও সেই স্রষ্টা কিসে সন্তুষ্ট আর কিসে অসন্তুষ্ট এবং তাঁর আদালতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে হিসাবের জন্য পেশ করতে হবে, এই চিন্তা করে সে কোনো ধরনের আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজসমূহ করেনি। এসব লোক নিজেদেরকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী ও আপন স্রষ্টার প্রতি দায়িত্বহীন অথচ বুদ্ধিমান জীব মনে করতো, যে জীবের একমাত্র করণীয় কাজ হলো, এই পৃথিবী নামক চারণ ভূমি থেকে যতোটা পারা যায়, ততোটা হাতিয়ে নেয়া—এটাই তারা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করতো। এসব লোকজন পৃথিবীতে যতো বড় কৃতিত্বমূলক কাজ সম্পাদন করুক না কেনো, পৃথিবী ধ্বংস হবার সাথে সাথে তাদের যাবতীয় কর্ম-কীর্তি ও কৃতিত্বও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিজেদের অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত সেবাকর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও ভবনসমূহ, রাস্তা-পথ, আসবাব-পত্র, কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, আবিষ্কারসমূহ, দাতব্যালয়-বিদ্যালয় সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব সৎকর্ম নিয়ে তারা কখনো মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে পারবে না।

সেখানে থাকবে শুধু কর্মের উদ্দেশ্য ও ফলাফল। যদি কারো সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য পৃথিবীর জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে থাকে এবং কাজের ফলাফলও পৃথিবীতেই কামনা করে থাকে, পৃথিবীতেই যদি নিজের কাজের সৎকাজের ফলও দেখে থাকে, তারপরেও তার সমস্ত আমল বা কাজই এই নশ্বর পৃথিবীর সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই শ্রেণীর লোকদের মনে আল্লাহ, রাসূল ও পরকাল সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় ছিল। অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে এদের মন-মানসিকতা সন্দেহে পরিপূর্ণ ছিল। এ জন্য তারা পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কর্ম করেছে। এদের কোনো সৎকর্মই আল্লাহ তা'য়ালা গ্রহণ করবেন না, যাবতীয় কর্ম তাদের মুখের ওপরে ছুড়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফুরকানের ২৩ নং আয়াতে বলেন–

وَقَدِمْنَا اِلى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا–

এবং তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নিয়ে আমি ধূলোর মতো উড়িয়ে দেবো।

ঈমানের দাবি যারা পূরণ করবে না, ঈমানের বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতি, আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, মতবাদ-মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হবে, তাদের যাবতীয় সৎকাজও ধ্বংস হয়ে যাবে, কিয়ামতের দিন এসবের কোনো বিনিময় পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالاِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه–وَهُوَ فِى الاخِرَةِ مِنَ الْخسِرِيْنَ–

যে ব্যক্তি ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়া হবে। (সূরা মায়িদা-৫)

যারা ইসলামী চিন্তা-চেতনার বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নীতি পদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধানাবলী অনুসরণ করবে, তারা পৃথিবীতে যতোই অর্থ-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদার অধিকারী হোক না কেনো, তাদের যাবতীয় সৎকর্মসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের দান-দক্ষিণা ও জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ প্রদান করা, কোনোই কিছুই তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا –وَاُولئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ–هُمْ فِيْهَا خلِدُوْنَ–

যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, আল্লাহর সাথে মোকাবেলায় না তাদের

ধন-সম্পদ তাদের কোনো উপকারে আসবে, না তাদের সন্তানাদি। এরা তো জাহান্নামে যাবে এবং চিরদিন সেখানেই থাকবে। (সূরা ইমরান-১১৬)

মুসলিম দাবিদার একশ্রেণীর লোক রয়েছে, আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি তাদের দৃঢ় ঈমান নেই। পরকালের প্রতি তাদের মন-মানসিকতা সংশয়ে দোদুল্যমান। এ জন্য এসব লোক পৃথিবীতে অবৈধ ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত থাকে, আবার এই উদ্দেশ্যেও মাঝে মধ্যে নামায-রোযা করে, সুযোগ বুঝে হজ্জও করে আসে এবং দান-খয়রাতও করে, কি জানি–পরকাল যদি সংঘটিত হয়েই যায়, তাহলে এসব কাজ তখন কিছুটা হলেও উপকারে আসবে। এই শ্রেণীর লোকদের যাবতীয় সৎকর্ম তথা আমলে সালেহ্ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এর কোনো প্রতিদান তাদেরকে দেয়া হবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এসব লোকদের নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কে বলেন–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً–حَتّٰى اِذَا جَاءَه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَه فَوَفّٰهُ حِسَابَه–وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ–

এবং যারা কুফরী করে তাদের কর্মের উপমা হলো পানিহীন মরুপ্রান্তরে মরীচিকা, তৃষ্ণাতুর পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছলো কিছুই পেলো না বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেলো, যিনি তার পূর্ণ হিসাব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসাব নিতে দেরী হয় না। (সূরা নূর-৩৯)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসারে ও প্রদর্শনীমূলকভাবে আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ করে এবং মনে মনে ধারণা করে যে, আখিরাত যদি হয়েই যায় তাহলে সেদিন এসব কাজের বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাদের এই ধারণা মরীচিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মরুভূমিতে দূর থেকে চিকচিক করা বালুকারাশি দেখে যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি তা একটি তরঙ্গায়িত পানির ধারা মনে করে নিজের পিপসা মিটানোর জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটতে থাকে, ঠিক তেমনি ঐ শ্রেণীর লোকগুলো ধর্মনিরপেক্ষ আমলে সালেহ্র ওপর মিথ্যা ভরসা করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরকালের দিকে অগ্রসর হয়।

কিন্তু মরীচিকার দিকে ছুটে চলা ব্যক্তি যেমন যে স্থানে পানির ধারা রয়েছে মনে করে ছুটে গিয়েছিল, তারপর সেখানে পৌঁছে বালু ছাড়া আর কিছুই পায় না, ঠিক

তেমনি ঐসব লোক আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করে দেখতে পাবে সেখানে তাদের জন্য কিছুই নেই। মৃত্যুর পরের জীবনে যে কাজের মাধ্যমে তারা লাভবান হবে বলে আশা পোষণ করেছিল, সে কাজ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, এটা দেখে তারা হতাশ হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, তারা দেখতে পাবে, যেখানে তারা পৌঁছেছে, সেখানে তাদের যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উপস্থিত রয়েছেন।

মুসলিম দাবিদার আরেক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে সব ধরনের লোকদের সাথে কপট সম্পর্ক বজায় রেখে জীবন পরিচালিত করে। যখন যে ব্যক্তি ও দলকে শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী দেখতে পায়, সেদিকেই তারা ঝুঁকে পড়ে। অর্থ ও কর্মতৎপরতা দিয়ে সহযোগিতা করে এবং বলে যে, 'আমরা আপনাদেরই সমর্থক, আপনাদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য আমরা নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছি।' এভাবে শক্তিশালী প্রত্যেক দল প্রভাব বিস্তারকারী লোকদের সাথে সম্পর্ক রেখে এরা নিজেদেরকে ঝামেলা মুক্ত রাখতে চায়।

যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, নিজেকে তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী হিসাবে উপস্থাপন করে নানাভাবে স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে। ইসলামপন্থীদেরকে শক্তিশালী দেখলে তারা এদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য নামায-রোযা আদায় করতে থাকে। অর্থ ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে এ কথাই প্রমাণ করে যে, 'আমরা মনে প্রাণে কামনা করি যে, আল্লাহর বিধান অনুসারে দেশ ও জাতি পরিচালিত হোক।'

কিয়ামতের ময়দানে এসব লোকদের যাবতীয় সৎকাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাহরা এদের করুণ অবস্থা দেখে বলবে-

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ امَنُوْا اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لا اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ-حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ

ঈমানদার লোকেরা বলবে, 'এরা কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে এই বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করতো যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি।' তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেলো। (মায়িদা-৫৩)

আরেক শ্রেণীর লোকজন রয়েছে যারা দান-খয়রাত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে। বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করে সে কথা লোকদের মধ্যে গর্বভরে প্রচার করতে থাকে। দান করে খোঁটা দেয়, দান গ্রহণকারীকে নিজের অনুগ্রহের দাস মনে করে। বার বার এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, 'আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম বলেই তুমি বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিলে বা আমি নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলাম বলেই তুমি আজ খেয়ে-পরে বাঁচতে পারছো।' এই শ্রেণীর লোকদের অন্তরে মহান আল্লাহর বিশ্বাস নেই এবং পরকালের ভয়ও তারা করে না। এদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى-كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَه رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-فَمَثَلُه كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَه وَابِلٌ فَتَرَكَه صَلْدًا-لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না, যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, আর না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, না পরকালের প্রতি। তার খরচের দৃষ্টান্ত এমন যে, যেমন একটি পাথুরে চাতাল, যার ওপর মাটির আস্তরণ পড়ে ছিল। এর ওপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে পানির স্রোতের সাথে মুছে গেলো এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে পড়ে থাকলো। এসব লোক দান-সদকা করে যে পুণ্য অর্জন করে, তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। (সূরা বাকারা-২৬৪)

উল্লেখিত আয়াতে 'বৃষ্টি' বলতে দান-সদকাকে বুঝানো হয়েছে আর পাথুরে 'চাতাল' বলতে হীন উদ্দেশ্য ও দুষ্ট মনোভাব তথা খারাপ নিয়্যতকে বুঝানো হয়েছে। যমীনের বুকে বৃষ্টি বর্ষিত হলে সেই যমীনে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়, ফসল উৎপাদন হয়। সর্বোৎকৃষ্ট সার হলো বৃষ্টির পানি। এই পানি শস্য ক্ষেতের জন্য বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু যে পাথুরে চাতালের ওপরে মাটির কয়েক ইঞ্চি আস্তরণ পড়ে থাকে, কঠিন পাথরের ওপরে মৃত্তিকার লেয়ার জমে থাকে। মাটির এই আস্তরণের ওপরে বীজ বপন করা হলে বা কোনো উদ্ভিদ সৃষ্টি হওয়ার পরে যখন প্রবল বেগে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে, তখন মহাকল্যাণকর সেই বৃষ্টির

পানি কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই ডেকে আনে। কারণ পানির স্রোতে পাথরের ওপর থেকে মৃত্তিকার আস্তরণ ক্রমশ মুছে গিয়ে উদ্ভিদ ও বপনকৃত বীজ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মৃত্তিকার আস্তরণের নীচ থেকে কঠিন পাথর উদ্ভাসিত হয়ে বীজ বপনকারীকে উপহাসই করতে থাকে।

তেমনি যাদের দান-সদকার পেছনে পরকালে বিনিময় লাভের উদ্দেশ্য থাকে না, মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে সন্তুষ্ট এবং নিজেকে দানবীর-দানশীল হিসাবে লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। দানের পেছনে বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। বৃষ্টির পানি যেমন পাথরের ওপর থেকে মাটির আস্তরণ সরিয়ে দেয়, তেমনি খারাপ নিয়্যাত তাদের যাবতীয় সৎকাজকে তথা আমলে সালেহ্কে ধ্বংস করে দেবে। দান-সদকা মানুষের মধ্যে কল্যাণময় ভাবধারার বিকাশ ও উন্নতি সাধনের জন্য যথেষ্ট ক্ষমতাশীল, কিন্তু তা উপকারী বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রকৃত সৎ উদ্দেশ্য, ঐকান্তিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা থাকতে হবে। উদ্দেশ্য যদি সৎ না হয়, তাহলে অনুগ্রহ, দয়া ও করুণার বৃষ্টি বর্ষণ করে অর্থ-সম্পদের অপচয় করা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

আখিরাতে যারা সফলতা অর্জন করবে

যারা ঈমান এনেছে এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে আমলে সালেহ্ করেছে, একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকেই মালিক ও মুনিব হিসাবে মেনে নিয়েছে, রাসূলকে একমাত্র নেতা হিসাবে অনুসরণ করেছে, নামায-রোযা আদায় করেছে, সাধ্যানুসারে যাকাত দিয়েছে, দ্বীনি আন্দোলন করেছে এবং মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখেছে, তারাই হলো মহান আল্লাহর দল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ–وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ–

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোক, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর

সম্মুখে অবনমিত হয়। আর যে ব্যক্তি বস্তুতই আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদার লোকদেরকে নিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাবে, তার এই কথা জানা দরকার যে, কেবলমাত্র আল্লাহর দলই জয়ী হবে। (সূরা মায়িদা-৫৫-৫৬)

মহান আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে–এ কথার অর্থ এটা নয় যে, যারা ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ্ করবে, এই পৃথিবীতে তারা বিপুল ধন-সম্পদ, বাড়ি, গাড়ি, কলকারখানার মালিক হবে, বৈষয়িক দিক থেকে এদের কোনো অভাব থাকবে না। বরং এ কথার অর্থ হলো, কিয়ামতের ময়দানে এরা এদের ঈমান ও আমলের বিনিময়ে বিজয়ী হবে। মহাক্ষতি থেকে তারা নিরাপদ থাকবে। অনেকে এই ধারণা পোষণ করে যে, পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে, তাদের তো কোনো অভাব থাকার কথা নয়। তারা অভাবহীন স্বচ্ছল জীবন-যাপন করবে। লোক সমাজে তারা বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবে।

কিন্তু বাস্তবে এই ধারণার বিপরীত অবস্থাই পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈমানদার লোকজন গরীব–অভাবী। বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, কলকারখানা নেই, লোক সমাজে প্রভাব–প্রতিপত্তি নেই। অর্থের অভাবে সন্তান-সন্ততিকে ভালো খাধ্য দিতে পারে না, উত্তম পোষাক দিতে পারে না, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করাতে পারে না।

অপরদিকে যাদের জীবনে নামায-রোযা নেই, পরকালের চিন্তা-চেতনা নেই। আল্লাহর অপছন্দনীয় পথই তাদের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়। সেই লোকগুলোর এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদের কোনো অভাব নেই। বিপুল ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব তাদের পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে। আপন রব-এর প্রতি অকৃতজ্ঞ এই অপরাধী লোকগুলো পৃথিবীতে অঢেল ধন-সম্পদ লাভ করে ধারণা করে যে, তারা যে সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুসারে জীবন পরিচালিত করছে, তার ওপরে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন বলেই তাদেরকে বিপুল ঐশ্বর্য দান করেছেন।

এদের অবস্থা হলো সেই গাধা আর খাসীর গল্পের মতো। এই দুটো পশুর যিনি মালিক তিনি খাসীটির প্রতি ছিলেন অধিক যত্নবান। এই অবস্থা দেখে খাসীটি একদিন গাধাটিকে ডেকে বললো, 'ব্যাটা গাধা! তুই তো আসলেই একটি গাধা!'

খাসীর কথা শুনে গাধাটি মনোক্ষুন্ন হয়ে খাসীটিকে বললো, 'আমি তো আসলেই গাধা, সুতরাং আমাকে এভাবে তাচ্ছিল্যভরে গাধা বলছো কেনো?'

খাসীটি বললো, 'বলছি এই জন্য যে মালিক আমার প্রতি কতটা যত্নশীল তা লক্ষ্য করেছো! তোমার প্রতি মালিকের কোনো যত্নই নেই। বরং তিনি বাইরে থেকে এসেই তোমাকে এক থাপ্পড় মারে আর যাবার সময়ও লাথি মারে।'

খাসীর কথা শুনে গাধা মুচ্‌কি হেসে বললো, 'খাসী! তোমার মালিক তোমার প্রতি এত যত্নশীল কেনো তা কি তুমি জানো? কোরবানীর চাঁদ উঠেছে, এই জন্য তোমার প্রতি মালিক এত যত্নবান।'

সুতরাং পৃথিবীতে ঈমানহীন পরকালের ভীতিশূন্য অপরাধী লোকদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অঢেল ধন-সম্পদ দান করেন, এর অর্থ এটা নয় যে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেন। বরং পৃথিবীতে এরা ঈমানহীন যে আমলে সালেহ্ করে, তার বিনিময়েই এদেরকে ধন-সম্পদ দান করা হয়। আল্লাহর দেয়া এই বিনিময় পরকাল পর্যন্ত দীর্ঘ হবে না। এই পৃথিবীতেই তাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয় এবং এরাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন। এরা জাহান্নামের জ্বালানী হবে বলেই পৃথিবীর জীবনে এদের বল্গাহারা ভোগ-বিলাস আর আপাদ-মস্তক নোংরামীতে পরিপূর্ণ জীবন-যাপন। এসব লোকের সম্পদ আছে কিন্তু শান্তি নেই। শান্তি নামক শব্দটিই এদের জীবনের পাতা থেকে মুছে গিয়েছে। শান্তির আশায় হন্য হয়ে এরা নানা ধরনের নাচ-গান, পার্টি-ক্লাব আর শরাবের স্রোতধারায় নিজেদেরকে ভাসিয়ে দেয়, তবুও শান্তির স্পর্শ এরা পায় না।

অনিয়ন্ত্রিত বল্গাহারা জীবন-যাপনের কারণে এদের দেহে নানা ধরনের দূরারোগ্য রোগ বাসা বাঁধে। এক পর্যায়ে চিকিৎসক এদের রিয্ক নিয়ন্ত্রন করে। চিকিৎসকের দেয়া তালিকা ও পরিমাপের বাইরে কোনো খাদ্য গ্রহণ করার অধিকার এদের থাকে না। চোখের সামনে স্ত্রী আরেক জনের হাত ধরে ক্লাব-পার্টিতে চলে যায়। মেয়ে রাতের পর রাত বয়ফ্রেন্ডদের সাথে রাত কাটায়, মেয়ের ভ্যানেটি ব্যাগ থাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। তারপরেও অসতর্ক মুহূর্তে মেয়ে কুমারী মাতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ছেলে মাতা-পিতার কথা শোনে না। এক পর্যায়ে ছেলে অন্ধকার জগতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়।

ঈমান ও পরকালের ভীতিশূন্য নারী-পুরুষ, এদের দাম্পত্য জীবনও স্থায়ী হয় না। এই শ্রেণীর শিল্পপতি, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, গায়ক-গায়িকা, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকাসহ নানা পেশায় নিযুক্ত নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে শান্তি নেই। পুরুষ একটির পর আরেকটি স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে, নারীও

একটির পর আরেকটি স্বামী পরিবর্তন করছে। ফলে সন্তান-সন্ততির জীবনে নেমে আসছে অন্ধকারের ঘোর অমানিশা। সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই ঈমান ও পরকালের ভীতিহীন নারী-পুরুষদের একই অবস্থা। শান্তির আশায় এরা উন্মাদ, অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা সবকিছুই আছে, কিন্তু শান্তি এদের জীবনে সোনার হরিণের মতোই। রাতে ঘুম হয় না, ঘুম নামক নে'মাত এদের জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে, ফলে নানা ধরনের ওষুধ ব্যবহার করে ঘুমের জগতে প্রবেশ করতে হয়।

অপরদিকে যারা ঈমানদার এবং পরকালকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করে, তাদের তেমন অর্থ-সম্পদ নেই। অভাব এদের নিত্যসঙ্গী–কিন্তু এদের জীবনে রয়েছে অনাবিল শান্তি। বৈধ পথে রিয্ক অর্জনের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়িতে ফিরে আসার সাথে সাথে প্রেমদায়িনী স্ত্রী সেবাযত্নের বাহু বিছিয়ে দেয়, ছেলে-মেয়ে মমতার ছায়া বিস্তার করে, ডাল-ভাত যা রান্না হয় তাই আহার করে আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। তারপর নামায আদায় করে বিছানায় শোয়ার সাথে সাথে গভীর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়। গোটা রাত পরম শান্তিতে ঘুমায়। যাবতীয় ব্যাপারে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে বলে এরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না, ঈমান ও মহান আল্লাহর স্মরণ এবং পরকালের ভীতিই এদের ভেতরে এই শান্তির ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেয়। আল্লাহ সূরা রা'দ-এর ২৮ নং আয়াতে বলেন–

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ–

নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণই হৃদয়ে শান্তির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেয়।

যারা ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্ করে, তারা যদি কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় বা দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত হয়, তখন তারা বিপদ থেকে মুক্তিদাতা মহান আল্লাহকেই ডাকে। বিপদগ্রস্ত কোনো মানুষ যখন শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে হৃদয়ের সবটুকু আবেগ-উচ্ছ্বাস উজাড় করে দিয়ে একবার মহান আল্লাহকে 'আল্লাহ' বলে ডাকে–মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তাঁর সেই গোলামের ডাকে ৭০ বার সাড়া দিয়ে বলেন, 'বান্দাহ্, আমি তোমার কাছেই আছি, বলো কি চাও।' পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ–اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ–

হে নবী! আমার বান্দাহ্ যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি সন্নিকটে। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। (সূরা বাকারা-১৮৬)

ঈমানদার সন্দেহ-সংশয়ে দোলায়িত হয়ে আপন রব আল্লাহ তা'য়ালাকে ডাকে না, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম-ভালোবাসা নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েই ডাকে। তাঁর আবেদনের মধ্যে কোনো ধরনের কৃত্রিমতা থাকে না। এ জন্য কবি বলেছেন–

دل سے جو بات نکلتی ھے اثر رکھتی ھے
پر نھیں ، طاقت پرواز مگر رکھتی ھے

দিল ছে যো বাত নিকাল তি হ্যায় আছর রাখ্তি হ্যায়
প্যর নাহি, তা-কতে পরওয়াজ মাগার রাখতি হ্যায়।

হৃদয় থেকে যে কথা নির্গত হয় তা প্রভাব বিস্তার করে। ডানা থাকে না কিন্তু উড়তে পারে।

যারা ঈমানদার এবং আমলে সালেহ্কারী, মহান আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন–

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ-وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُ هُمْ مِّنْ فَضْلِه-

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর জানা রয়েছে। তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের দোয়া কবুল করেন এবং নিজের দয়ায় তাদের আরো অধিক দেন। (সূরা শূরা-২৫-২৬)

ধন-ঐশ্বর্য্য সফলতার মানদন্ড নয়

ইতোপূর্বে গাধা ও খাসীর গল্পের অবতারণা করে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, খাসীর যত্ন তার মালিক এ জন্য বৃদ্ধি করেছে যে, কোরবানীর চাঁদ উঠেছে এবং তাকে কোরবানী করা হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ বিরোধী লোকদেরকে তাদের ঈমানহীন

সৎকাজের বিনিময় হিসাবে এই পৃথিবীতে অধিক ধন-ঐশ্বর্য্য দান করা হয়েছে এ কারণে যে, তাদের সৎকাজ তথা আমলে সালেহ্‌র পেছনে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না বিধায় তাদের পাওনা এই পৃথিবীতেই পরিশোধ করা হয়েছে। এভাবে করে অতীত যুগে ফেরাউন, নমরুদ এবং তাদের অনুরূপ প্রত্যেক যুগে যারা ভূমিকা পালন করেছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে সম্পদশালী করেছেন। তাদেরকে পৃথিবীর জীবনে শান-শওকত, চাকচিক্য ও অর্থ-সম্পদ দেয়া হয়েছে। যারাই মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের ভূমিকা পালন করছে, তাদেরকে এভাবেই পৃথিবীতে কর্মের বিনিময়ে তাদের পাওনা পরিশোধ করা হচ্ছে।

ইসলাম বিরোধী লোকদের এই চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন দেখে এক শ্রেণীর দুর্বল ঈমানের লোকগুলো দ্বীনে হক সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়। এরা প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কল্যাণ ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে না, তারা ইসলাম বিরোধী আদর্শের মোকাবেলায় দ্বীনে হক-এর দুর্বলতা আর 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী লোকগুলোর ক্রমাগত অসফলতা এবং ইসলাম বিরোধিদের চাকচিক্যপূর্ণ ও জাঁকজক এবং পার্থিব নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দেখে ধারনা করে যে, আল্লাহ্ বিরোধী লোকগুলোই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব অর্জন করুক, তারাই সর্বত্র সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হোক, প্রভাব বিস্তার করুক আর যারা 'হক'-এর দাওয়াত দেয়, তারা তারা দুর্বল ও প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে থাক–এটাই মহান আল্লাহর অভিপ্রায়।

কারণ ইসলাম বিরোধী শক্তির বাহ্যিক চাকচিক্য, জাঁকজমক ও সাজ-সজ্জা, সভ্যতা, সংস্কৃতির সৌন্দর্য, উন্নতি-অগ্রগতির কারণে পৃথিবীর মানুষ তাদের অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা অনুসরণ করতে থাকে। তারা উপায়-উপদানের প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের নীতি-আদর্শ ও কর্ম কৌশলকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে পৃথিবীতে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে আর 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীরা নিজেদের কর্ম কৌশল বাস্তবায়ন করার তেমন কোনো উপায়-উপাদান পাচ্ছে না, এদের লোকবল নেই, অর্থবল নেই, প্রচার যন্ত্র নেই, কোনো কিছুরই প্রাচুর্যতা নেই। ব্যক্তি জীবনেও এরা দারিদ্রতার সমুদ্রে নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছাই এটা। তিনি হকপন্থীদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখবেন।

দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকগুলো এই অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে 'হক' তথা মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এখন বরং নামায-রোযা, কোরআন তিলাওয়াত ও তসবীহ্ জপার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী পরিবেশে জীবন-যাপন করাই যুক্তি সংগত। এই ধরনের অমূলক চিন্তা-ভাবনা যারা করে, তারা মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী লোকগুলোকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত লোকগুলোর অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলেন–

فَاسْتَقِيْمَا وَلاَ تَتَّبِعٰنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ–

নিজ কর্মপন্থার ওপরে দৃঢ়-মজবুত হয়ে থাকো এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না। (সূরা ইউনুস-৮৯)

দ্বীনে হক বিরোধী, মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে যারা জীবন-যাপন করে না তাদের অঢেল ধন-সম্পদ দেখে 'হক'-এর দাওয়াত দানকারী নিজের অভাব ও দারিদ্রতার কথা স্মরণ করে ক্ষণিকের জন্যও মনোক্ষুন্ন হবে না। কারণ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে আখিরাতের জীবনে সর্বোত্তম বিনিময় দান করবেন আর ঐ লোকগুলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল করবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَامَتَّعْنَا بِه اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ–

আমি তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পৃথিবীতে যে সম্পদ দিয়েছি সেদিকে তুমি চোখ উঠিয়ে দেখো না এবং তাদের অবস্থা দেখে মনোক্ষুন্ন হয়ো না। (সূরা হিজ্‌র-৮৮)

ব্যর্থতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত–কারূণ

আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীতে মানুষকে ধন-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করেন এবং না দিয়েও পরীক্ষা করেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে একজন লোক ছিলো, পবিত্র কোরআন যাকে 'কারূণ' নামে উল্লেখ করেছে। এই লোকটি নিজ জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ জাতির বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছিলো। সরকারী অনুকম্পা লাভ করে এই ব্যক্তি বিপুল ধন-ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়েছিলো। তার ইতিহাস আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسى فَبَغى عَلَيْهِمْ-وَاتَيْنهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَه لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُوْلِى الْقُوَّةِ-اِذْ قَالَ لَه قَوْمُه لاَ تَفْرَحْ اِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ-وَابْتَغِ فِيْمَا اتكَ اللّهُ الدَّارَ الاخِرَةَ وَلاَتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّهُ اِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الاَرْضِ-اِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

এ কথা সত্য, কারূণ ছিলো মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তাদের চাবিগুলো বলবান লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো। একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, 'অহঙ্কার করো না, আল্লাহ অহঙ্কারীদেরকে পসন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরী করার কথা চিন্তা করো এবং পৃথিবী থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা কাসাস-৭৬-৭৭)

নিজ জাতির সাথে বিশ্বাঘাতকতা করে কারূণ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনে ব্যস্ত ছিলো। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ ফেরাউন তাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলো এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে লোকটি তৎকালীন যুগে শ্রেষ্ঠ ধনকুবের-এ পরিণত হয়েছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীরা যখন তাকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত থেকে আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য 'হক'-এর দাওয়াত দিলেন, তখন লোকটি আপন রব মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করে দম্ভভরে জবাব দিয়েছিলো–

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُه عَلى عِلْمٍ عِنْدِىْ-

এতে সে বললো, 'এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।' (সূরা কাসাস-৭৮)

অর্থাৎ আমি আমার জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমতা, কলা-কৌশল কাজে লাগিয়ে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেছি। কেউ আমাকে অনুগ্রহ করে এসব দান করেনি।

এই দাম্ভিক ও অহঙ্কারী লোক এবং তার অনুরূপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা কাসাস-এর ৭৮ নং আয়াতে বলেন–

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِه مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا-وَلاَ يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ-

সে কি এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহু বল ও জনবলের অধিকারী ছিলো? অপরাধীদেরকে তো তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস্ করা হয় না।

ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের অহঙ্কারে যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের ঐসব গোষ্ঠীর ধ্বংসের ইতিহাস জানা উচিত, যারা তার তুলনায় অনেক গুণ বেশী অর্থ-সম্পদ ও শক্তির অধিকারী ছিলো। অহঙ্কারের পদভারে তারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। মহান আল্লাহ পৃথিবী থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা যখন অপরাধীদের ওপরে আযাবের চাবুক হানেন, তখন তাদেরকে এ কথা বলা হয় না যে, 'তোমরা অমুক অপরাধে লিপ্ত ছিলে, এই কারণে তোমাদের ওপরে আঘাত হানা হচ্ছে।' বরং আচমকা তাদের ওপরে আযাবের চাবুক হানা হয়।

কারুণের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে এক শ্রেণীর লোভী লোকজন মনে করতো, লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। নিজেদের ধন-সম্পদ না থাকার কারণে তারা আক্ষেপ করতো। তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ শোনাচ্ছেন–

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِه فِىْ زِيْنَتِه قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنَ اِنَّ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ-

একদিন সে (কারুণ) তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা পৃথিবীর জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিলো তারা তাকে দেখে বললো, 'আহা! কারূণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরা পেতাম! সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।' (সূরা কাসাস-৭৯)

সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড যাদের জানা ছিল না বা যারা পৃথিবীর জীবনে সম্মান-মর্যাদা ও বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়াকেই প্রকৃত সফলতা বলে বিশ্বাস করতো, তারা ধারণা করতো, কারুণ বড়ই সফল ব্যক্তি–লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। তারা আক্ষেপ করে বলতো, আমরাও যদি কারুণের অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারতাম! ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত এই মূর্খ লোকগুলোর মূর্খতা দেখে হকপন্থীরা তাদেরকে বলতো, 'তোমরা যাকে সফলতা বলে ধারণা করছো তা সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতা হলো মহান আল্লাহ্ প্রতি ঈমান আনা এবং আমলে সালেহ্ করা। আর ঈমান আনা ও আমলে সালেহ্ করা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ধৈর্যশীল।' হকপন্থীরা কিভাবে 'হক'-এর দাওয়াত দিয়েছিলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তা সূরা কাসাস-এর ৮০ নং আয়াতে শোনাচ্ছেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ يُلَقّٰهَا اِلاَّ الصّٰبِرُوْنَ-

কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলতে লাগলো, 'তোমাদের অবস্থা দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারে না।

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পুরস্কার শুধুমাত্র ঐ লোকগুলোর জন্যই নির্ধারিত যাদের মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা রয়েছে। বৈধ পন্থায় উপার্জন করার ব্যাপারে যারা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। এই পথে দিন শেষে যদি তাদের ভাগ্যে একটি শুক্‌নো রুটি জোটে তবুও তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে আর যদি বৈধ পথে উপার্জনের মাধ্যমে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়ে যায়, তবুও তারা মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস, অর্থ-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ার সুযোগ দেখা দিলেও তারা অবৈধ পথের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। অবৈধভাবে তদবীর-তাগাদা করে এবং প্রভাব বিস্তার করে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। বৈধ পথে উপার্জন তা যতো সামান্যই হোক না কেনো, এতেই তারা তৃপ্তি লাভ করে।

পৃথিবীতে যারা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে, তাদের শান-শওকত দেখে মনের মধ্যে ঈর্ষা ও কামনা-বাসনার জ্বালায় ব্যাকুল হবার পরিবর্তে ঐসব অবৈধ জাঁকজমকের প্রতি চোখ তুলে না তাকানো এবং ধীর

স্থির মস্তিষ্কে এ কথা অনুধাবন করা যে, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদারের জন্য পৃথিবীর এ চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় এমন নিরাভরণ পবিত্রতাই সর্বাধিক উত্তম যা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ্ করে তাকে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক কারূণের ধন-সম্পদ দেখে যেসব লোক তার অনুরূপ ধন-সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলো, কারূণকে যারা সফল ব্যক্তি মনে করতো, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা খুব দ্রুত তাদের ধারণা পরিবর্তন করে দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা আর বিপর্যয় সৃষ্টির শেষ সীমা অতিক্রম করলো কারূণ। মহান আল্লাহ্ পক্ষ থেকে তার ওপরে আযাবের চাবুক হানা হলো। সূরা কাসাস-এর ৮১-৮২ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ-فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ-وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ-وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ-لَوْ لَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ-

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদা লাভের আকাংখা পোষণ করছিলো তারা বলতে লাগলো, 'আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুঁতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিলো না, কাফিররা সফলকাম হয় না।

অর্থাৎ আমরা এই ভুলে নিমজ্জিত ছিলাম যে, পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করাই হলো সফলতা। এ কারণে আমরা ধারণা করে ছিলাম যে কারূণ বিরাট সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা দেখে আমাদের ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমরা আসল সত্য অনুধাবন করতে পারলাম যে, প্রকৃত সফলতা ভিন্ন জিনিস, যা আল্লাহ বিরোধিদের ভাগ্যে কখনো জোটে না।

'হক'-এর দাওয়াত যারা দেন, তারাও মানুষ এবং মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। 'হক'-এর দাওয়াত দেয়ার পথ কন্টকাকীর্ণ পথ-এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথে চলতে গেলে নানা ধরনের বিপদ-মুসিবতে নিমজ্জিত হতে হবে। নিন্দা, অপবাদ আর কটুবাক্য বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হতে থাকবে। এতে করে ক্ষণিকের জন্য হলেও 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতায় বিসন্নতা ছেয়ে যেতে পারে। মনে এই চিন্তা জাগতে পারে যে, 'আমি যে লোকগুলোকে ধ্বংস আর ক্ষতির পথ থেকে ফিরিয়ে কল্যাণ আর সফলতার পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, সেই লোকগুলোই আমাকে এভাবে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জর্জরিত করছে।' মনে এই ধরনের চিন্তা জাগরুক হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহর রাসূলও দাওয়াতের ময়দানে লোকদের কাছ থেকে এমন আঘাত পেতেন। তাঁর মনও ব্যথাভারাক্রান্ত হতো। এই অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার পথনির্দেশনা মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এভাবে দিয়েছেন–

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ-فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّجِدِيْنَ-وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ-

আমি জানি, এরা তোমার সম্পর্কে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রব-এর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁরই সকাশে সিজ্‌দাবনত হও এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রব-এর বন্দেগী করে যেতে থাকো। (সূরা হিজ্‌র-৯৭-৯৯)

অর্থাৎ 'হক'-এর দাওয়াত দিতে গিয়ে যে বিপদ-মুসিবত, নিন্দা-অপবাদ, কলঙ্ক হকপন্থীদের প্রতি ছুড়ে দেয়া হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যাচার প্রচার করা হচ্ছে, তার মোকাবেলা করার শক্তি তারা একমাত্র নামায ও মহান আল্লাহর বন্দেগী করার ক্ষেত্রে অবিচল দৃঢ়তার পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই অর্জন করা যাবে। নামায-রোযা আদায়, আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণই 'হক'-এর দাওয়াত দানকারীর মন-মানসিকতা থেকে বিসন্নতা দূর করে প্রশান্তিতে ভরে দেবে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করবে, সাহসিকতা ও বীরত্ব সৃষ্টি করবে এবং 'হক'-এর দাওয়াত পেশকারীকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে, যার

ফলশ্রুতিতে গোটা পৃথিবীর মানুষের ছুড়ে দেয়া নিন্দাবাদ, অপবাদ আর প্রতিরোধের মোকাবেলায় দাওয়াত দানকারী অটুট মনোবলের সাথে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। আর এই পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি।

সম্মান মর্যাদার প্রকৃত মানদন্ড

পবিত্র কোরআনের ত্রিশ পারার সূরা আল ফজর-এর ১৫ থেকে ১৬ নম্বর আয়াতে মানুষের সাধারণ নৈতিক অবস্থার সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মানুষরা এমন হয় যে, যখন তার মালিক তাকে অর্থ ও মর্যাদা দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন এবং সম্মান দান করেন তখন সে বলে হ্যাঁ আমার মালিক আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি ভিন্নভাবে তাকে পরীক্ষা করেন এবং এক পর্যায়ে তার রেযেককে সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে নাখোশ হয়ে বলে, আমার মালিক আমাকে অপমান করেছেন।'

কোরআনের জ্ঞান বিবর্জিত কুসংস্কারে বিশ্বাসী বর্তমানের অধিকাংশ লোকদের মতো আরবের সে যুগের লোকদেরও বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি অধিক প্রিয়, তিনি তাকেই অঢেল ধন-সম্পদ দান করেন। আর তিনি যাদেরকে অপছন্দ করেন, তাদেরকে দারিদ্রতার নিষ্পেষণে জর্জরিত করেন। এ কথা তারা বিশ্বাস করতো না যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও স্বল্পতা—এই উভয় অবস্থার মধ্যে মানুষকে নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি দেখতে থাকেন, অঢেল ধন-ঐশ্বর্য হস্তগত হলে মানুষ কি ধরনের চরিত্র প্রকাশ করে আর দৈন্যতার মধ্যেই বা মানুষ কোন্ ধরনের আচরণ করতে থাকে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে সে অহঙ্কারী, অত্যাচারী হয়ে ওঠে না মানবতার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটায়। আপন প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, অথবা আপন মনিব আল্লাহর কথা ভুলে যায়। আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ থেকে সে অবারিত হস্তে সাহায্যপ্রার্থী বা অভাবীদেরকে দান করে, না অভাবী সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দেয়। আল্লাহর দ্বীনের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাকে 'একটি আযাব বিশেষ' বলে মনে করে, না আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে মানসিক তৃপ্তি লাভ করে।

আর অভাব এবং দৈন্যতায় আক্রান্ত হয়ে আপন প্রভুকে অভিসম্পাত দিতে থাকে, না ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে। চরম দরিদ্র আর দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে ধৈর্যের পথ অবলম্বন করে, না অসহিষ্ণু হয়ে

ন্যায়-অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে অর্থ-সম্পদ আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দারিদ্রের সর্বগ্রাসী অভিশাপ যখন সমস্ত কিছুকেই গ্রাস করে, তখন সে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির ভয়ে অন্যায়-অবৈধ পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত থাকে, না পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে সামান্য কয়েকদিনের সুখভোগের লক্ষ্যে অবৈধ পথে অগ্রসর হয়। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়ার জন্যই তিনি কাউকে ধন-সম্পদ দান করেন এবং কাউকে দৈন্যতায় নিক্ষেপ করেন।

আখিরাতের প্রতি উদাসীন ও উপেক্ষা প্রদর্শনকারী লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই হলো সম্মান এবং মর্যাদার মানদন্ড। এসব জিনিস যার হস্তগত হয়েছে, তিনিই পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত রয়েছে, যারা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারেনি, তারা সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী নয়। এই ঘৃণিত নীতির আবর্তেই পৃথিবীতে মানবতা আবর্তিত হচ্ছে। উন্নত চরিত্র, উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকমান, সততা, মহানুভবতা, ন্যায়-পরায়ণতা, জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি, পান্ডিত্য এসবের কোন মূল্য দেয়া হয় না। এসব দুর্লভ গুণ ও বৈশিষ্ট্য যে সব দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে নিহিত রয়েছে, মানব সমাজে এরা অপাংতেয়। সমাজের কোন একটি স্তরেও নেতৃত্বের আসন লাভের যোগ্য এরা নন। জাতির পরিচালকদের কাছেও এরা গুণীজন হিসাবে বিবেচিত হন না। সামাজিক বা জাতিয় কোন অনুষ্ঠানেও এরা দাওয়াত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না। এদের একটিই অপরাধ, কেন তারা ধন-সম্পদ আর প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হননি।

আর আপাদ-মস্তক যাদের নোংরামীতে নিমজ্জিত, কদর্যতা আর কলুষতাই যাদের চারিত্রিক ভূষণ, ন্যায়-অন্যায়বোধটুকু যারা বিসর্জন দিয়েছে, দুষ্কৃতি আর দুর্নীতির উচ্চমার্গে যাদের অবস্থান, অশ্লীলতা আর নোংরামীর যারা স্রষ্টা, পরস্বার্থ অপহরণে যারা পারদর্শী, ব্যক্তিস্বার্থের কাছে যারা জাতিয়স্বার্থ বলিদানে উন্মুখ, সততা, ন্যায়-নীতি শব্দগুলো যারা পরিহার করে চলে, এসব লোকগুলোই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এরাই জাতিয় হিরো এবং গুণীজন হিসাবে বরিত হয়ে থাকে। কারণ এদের রয়েছে অবৈধ পথে উপার্জিত অঢেল অর্থ-সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি। সমাজের ক্ষুদ্র একটি নেতৃত্বের আসন থেকে শুরু করে দেশের বৃহত্তর নেতৃত্বের আসনে এরাই সমাসীন। পরকালে অবিশ্বাসী এসব ভ্রষ্ট ও চরিত্রহারা লোকগুলো নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে রয়েছে বলেই সর্বত্র অশান্তি, বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।

মানুষের ভেতরে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, অর্থ-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই হলো সম্মান এবং মর্যাদার মানদন্ড—এই ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে সূরা আল ফজর-এর ১৭ থেকে ২০ নম্বর আয়াতসমূহে। ১৭ নম্বর আয়াতের প্রথম শব্দটিতেই বলা হয়েছে, كَلَّا 'কাল্লা' অর্থাৎ কখনো নয় বা এমনটি নয়। অর্থাৎ তোমরা যে ধারণা অনুসারে অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকেই সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছো, তা সত্য নয়। এসব বিষয় সম্মান ও অসম্মানের মানদন্ড কখনো হতে পারে না। কোন ব্যক্তির চরিত্র উন্নত না নিকৃষ্ট, তা বিবেচনা না করেই এবং এর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা বিচার বিবেচনায় না এনে একমাত্র অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকেই সম্মান-মর্যাদা ও অপমানের মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছো, এটা তোমাদের মারাত্মক ভুল ধারণা আর বুদ্ধির দৈন্যতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, ধন-সম্পদের মোহ তোমাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, সমাজে যারা ইয়াতিম, তাদের ধন-সম্পদ পর্যন্ত তোমরা আত্মসাৎ করে নিজের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করছো।

সম্মান-মর্যাদা ও অপমানের যে মানদন্ড তোমরা নির্ধারণ করেছো, এটা বহাল থাকলে ন্যায়ের মাথায় পদাঘাত করে অবৈধ পথে অপরের সম্পদ ও ইয়াতিমদের সম্পদ কৌশলে আত্মসাৎ করার পথে কোনই প্রতিবন্ধকতা থাকে না। পিতা অথবা পিতা-মাতা উভয়ের অবর্তমানে ইয়াতিমরা চরম অসহায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের অসহায়ত্বের সুযোগে তোমরা প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করো। এই ইয়াতিমদের পিতা অথবা পিতা-মাতা উভয়েই জীবিত থাকা অবস্থায় তোমরা এদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেছো। যখনই তারা পিতাকে হারিয়ে চরম এক অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়েছে, তখনই তোমাদের দৃষ্টিতে তারা করুণার পাত্র এবং লাঞ্ছনা-অপমান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত হয়েছে। এই ইয়াতিমরা তোমাদের দৃষ্টিতে কোন ধরনের অধিকার লাভের যোগ্য নয়।

শুধু তাই নয়, অভাবীদেরকেও তোমরা কোনই সাহায্য করো না। তোমাদের প্রতিষ্ঠিত শোষণমূলক নীতির কারণে অর্থ-সম্পদের ওপরে একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম করেছো তোমরা। শোষিত শ্রেণী ক্ষুধার্ত অবস্থায় এক মুঠো খাদ্যের আশায় যখন তোমাদের দুয়ারে ধর্ণা দেয়, তখন তোমরা যেমন ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে খাদ্য দাও না, তেমনি অন্যকেও অভাবীদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে বা খাদ্য

দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দাও না। এমনকি তোমাদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করে তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ সুষম বন্টন না করে নিজেই কুক্ষিগত করো। তৎকালীন আরব সমাজে মৃত ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ বন্টনের এক অদ্ভুত নীতি প্রচলিত ছিল। মৃত ব্যক্তির যাবতীয় অর্থ-সম্পদ পরিবারের পুরুষদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি লাভ করতো, যে ব্যক্তি ছিল যুদ্ধবাজ। যুদ্ধ করা এবং পরিবারবর্গের সংরক্ষণ করার ক্ষমতা যার ভেতরে ছিল, সে-ই যাবতীয় অর্থ-সম্পদ দখল করতো। অর্থাৎ শক্তিশালী ব্যক্তি অন্যান্য শরীকদের বঞ্চিত করে একাই সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যেতো। পরিবারের অসহায়, অক্ষম, দুর্বল, নারী ও শিশুদেরকে, ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হতো। আরব জাহিলিয়াতের ঐ ঘৃণ্য প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মতো বর্তমান সমাজকেও আক্রান্ত করেছে। শোষণমূলক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে একদিকে সৃষ্টি হয়েছে শোষক শ্রেণী আরেকদিকে সৃষ্টি হয়েছে শোষিত শ্রেণী। বৈধ পথে সহজে অর্থোপার্জনের যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। দেশে শোষক শ্রেণীর হাতে পূঁজি আবর্তিত হবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং এ কারণেই ধনীর অর্থ-সম্পদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে আর গরীব ক্রমশঃ নিঃস্বই হয়ে যাচ্ছে।

সাহায্য-সহযোগিতা লাভের আশায় অভাবী-গরীব লোকজন ধনীর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে পথও তাদের জন্য রুদ্ধ করা হয়েছে। সমাজের অসহায়, দুর্বল, অক্ষম ও ইয়াতিমদের সম্পদ দখল করার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের কৌশলের উদ্ভাবন করা হয়েছে। কল-কারখানা, লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জায়গা-জমির প্রয়োজনে পূঁজিপতি ধনীক শ্রেণী কৌশলে দুর্বলের জায়গা দখল করে অথবা স্বল্পমূল্যে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করে। দেশের প্রচলিত আইনও এদেরকেই সহযোগিতা করে। অপরকে ঠকানো, অন্যের অধিকার খর্ব করা, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার লক্ষ্যেই আখিরাতে অবিশ্বাসী লোকজন তাদের মন-মগজ প্রসূত নিয়ম-পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত করেছে।

এসব করা হয়েছে মাত্র একটিই উদ্দেশ্যে যে, তারা অর্থ-সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ধন-সম্পদ এদের কাছে এতটাই প্রিয় যে, তা অর্জনের জন্যে এরা যে কোন পথ অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না। নিজের দেশের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মোড়ল রাষ্ট্রগুলো অনুন্নত দুটো দেশের মধ্যে উস্কানি দিয়ে যুদ্ধ বাধায়। এরপর শুরু করে উভয় রাষ্ট্রের কাছে মারণাস্ত্র বিক্রির

ব্যবসা। দুর্বল রাষ্ট্রকে তার দেশের খনিজ সম্পদ বিক্রি করে নিঃস্ব হতে বাধ্য করা হচ্ছে। অশ্লীল অশালীন চরিত্র বিধ্বংসী গ্রন্থ রচনা এবং ছায়াছবি নির্মাণ করে তা দেশে দেশ সরবরাহ করে প্রভূত অর্থ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। এভাবে নানা কৌশলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিশালী দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোকে অন্যায়ভাবে শোষণ করছে, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

দেশের অভ্যন্তরেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে আখিরাতের প্রতি উদাসীন লোকগুলো দ্রুত অর্থ-বিত্তের মালিক হবার লক্ষ্যে সুদ, ঘুষ, মাদক ব্যবসা, নারী দেহের ব্যবসা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসায় লিপ্ত হয়। তার ব্যবসার কারণে জাতিয় চরিত্র কোন নিম্ন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হলো, সমাজে কোন ধরনের অশান্তি আর বিপর্যয় সৃষ্টি হলো এর কোনদিকেই অর্থলোলুপ লোকগুলো দৃষ্টি দেয় না। অর্থ এদের কাছে এত অধিক প্রিয় বস্তু যে, তা অর্জনের জন্য এরা মানুষ অপহরণ করে তার দেহের রক্ত, কিড্‌নী ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি করে। শুধু তাই নয়, অর্থলোভীরা মানব কংকালের ব্যবসা পর্যন্ত শুরু করেছে।

অর্থলোলুপ লোকগুলো এই ধরনের জঘন্য কর্মকান্ডে এ জন্যই লিপ্ত হয় যে, এরা বিশ্বাস করে এমন কোন সত্তা নেই, যিনি তাদের প্রতিটি কর্মকান্ড রেকর্ড করে রাখছেন, যাবতীয় গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখছেন এবং যার কাছে মৃত্যুর পরে জবাবদিহি করতে হবে। সুন্দর করে সাজানো এই পৃথিবীটা কখনো কোনদিনই ধ্বংস হবে না, চিরযৌবনা এই পৃথিবীর যৌবন অনন্তকাল অটুট থাকবে, বার্ধক্য এই পৃথিবীকে হানা দেবে না, হবে না পৃথিবী কখনো জরাগ্রস্ত।

সুতরাং নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ভোগ-বিলাস ও উত্তরাধিকারীদের প্রাচুর্যতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিক সম্পদ বৃদ্ধিই এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

সূরা আল ফজর-এর ২১ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত মানুষের এই ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে, অর্থলোলুপদের প্রতি অবিমিশ্রিত ঘৃণা বর্ষণ করা হয়েছে এবং এদের নিকৃষ্ট পরিণতির চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। ২১ নম্বর আয়াতের প্রথম শব্দেই বলা হয়েছে, অসম্ভব! কখনোই না, তোমরা যা ধারণা করছো, অবশ্যই তা নয়। নানা চিত্রে, অপূর্ব অলংকারে, মনোরম দৃশ্যে সাজানো এই পৃথিবীর সবটুকু যৌবন নির্মম হাতে শোষণ করে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা বানিয়ে দেয়া হবে। সমস্ত পৃথিবীটাকে

চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলায় পরিণত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে। দেখার যদি সেদিন কেউ থাকতো তাহলে সে দেখে কল্পনাও করতে পারতো না, পৃথিবী নামক গ্রহটায় কখনো সৌন্দর্যের কোন চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

মহাধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমস্ত মৃত মানুষদের ভেতরে প্রাণের সঞ্চারিত করা হবে। তারপর তারা সবাই উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। পৃথিবীতে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে যা রয়েছে, তা সেদিন দৃষ্টি গোচরে আনা হবে। প্রজ্জ্বলিত জাহান্নাম মানুষের সামনে উপস্থিত করা হবে। অগণিত ফেরাশ্‌তাদেরকে মানুষ দেখতে পাবে। মানুষের সৎকাজ ও অসৎকাজ পরিমাপ করার জন্য পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হবে। হিসাব গ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি মানুষ সেদিন দেখতে পাবে। পৃথিবীতে মানুষ গোপনে যা করেছে, প্রকাশ্যে যা করেছে, তা সবই সেদিন সর্বসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহর বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতাকে যারা পৃথিবীতে অস্বীকার করতো, কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না বলে বিশ্বাস করতো, তারা সেদিন দেখতে পাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রচন্ড প্রতাপ। আল্লাহর পক্ষ থেকে সেদিন ঘোষণা দেয়া হবে–

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ-لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-

আজ বাদশাহী ও রাজত্ব কার? কে একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী? সমস্ত সৃষ্টিলোক থেকে আওয়াজ উঠবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি কাহ্‌হার। (সূরা মু'মিন-১৬)

পৃথিবীতে অসংখ্য ভ্রান্ত পথ ও মতের অনুসারী জালিম গোষ্ঠী ও দল নিজেদের ক্ষমতার এবং শক্তিমত্তার অহঙ্কারে ধারণা করতো, তাদের মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই। তাদেরকে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারে বা তাদের মোকাবেলা করতে পারে, এমন শক্তির কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মানুষদের মধ্যে অধিকাংশ লোকগুলো এসব জালিমদের আনুগত্য ও প্রশংসা করতো। কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে, আজ বলো প্রকৃত শাসনদন্ড কার হাতে–বাদশাহী ও রাজত্ব কার? যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী কে? সবর্ত্র কার আদেশ চলছে?

এই বিষয়গুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন মানুষ যদি বিষয়টি অনুধাবন করে, তাহলে সে যত বড় ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন, তার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি না হয়ে পারে না। চরম অহঙ্কারী ব্যক্তিও বিনয়ী না হয়ে পারে না। সামানী বংশের প্রতাপশালী শাসক নাসর ইবনে আহ্‌মদ নিশাপুরে আগমন করে একটি দরবার-

আহ্বান করেন। তারপর তিনি আদেশ জারী করেন, তিনি সিংহাসনে আসীন হবার পর আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করা হবে এবং তারপরেই দরবারের কাজকর্ম শুরু হবে। একজন আলেম আল্লাহর কোরআনের সূরা মু'মিনের ১৬ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলেন। যার অর্থ হলো, 'আজ বাদশাহী ও রাজত্ব কার? কে একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী? সমস্ত হাশরের ময়দান থেকে আওয়াজ উঠবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি কাহ্হার।' কোরআনের এই আয়াত শুনে তিনি এতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, কাঁপতে কাঁপতে তিনি সিংহাসন থেকে নেমে মাথার রাজমুকুট খুলে সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন, 'হে আমার রব! সমস্ত বাদশাহী এবং ক্ষমতা একমাত্র তোমারই-আমি তোমার গোলাম।'

কিয়ামতের দিনের ভয়াল চিত্র দেখে মানুষ ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে যাবে। চোখের পলক ফেলতেও তারা ভুলে যাবে। সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যিনি নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তিনিই সেদিন প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাঁর সামনে কারো পক্ষে সামান্য একটি শব্দ করারও সাহস হবে না। তিনিই সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। যে ফেরেশ্তারা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর আদেশ পালন করছে, তারা সেদিন নীরব নিস্তব্ধ মূক-বধিরের মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবতীয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমার রব সেদিন স্বয়ং আবির্ভূত হবেন' এ কথাটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহর যে অসীম ক্ষমতার কথা ও কিয়ামতের দিনের দৃশ্যের কথা শোনাচ্ছেন, সেদিন মানুষ এই চর্মচোখে তা প্রত্যক্ষ করবে। পৃথিবীর বুকে সবথেকে ক্ষমতাধর ব্যক্তিও সেদিন আল্লাহর প্রবল প্রতাপের সামনে থর থর করে কাঁপতে থাকবে। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রকাশ সেদিন মানুষের সামনে ঘটবে, এই অর্থেই বলা হয়েছে, সেদিন তোমার রব্ব স্বয়ং আবির্ভূত হবেন।

আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নবী-রাসূলগণ মানুষকে সতর্ক করেছে, কিন্তু তারা তাঁদের কথার প্রতি কর্ণপাত করেনি। মিরাসী সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ অন্যান্য হকদারদের মধ্যে বন্টন না করে পৈশাচিক লোভের বশবর্তী হয়ে এবং অদম্য আকাংখা নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে একাই আত্মসাৎ করেছে। অক্ষম, দুর্বল, অসহায়-ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ শক্তির বলে দখল করেছে। অবৈধ পথে অর্থ-সম্পদের স্তুপ গড়েছে। অন্যায় পথে অর্থোপার্জন করতে গিয়ে দেশ,

সমাজ ও মানবতার কি মারাত্মক ক্ষতি করেছে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়নি। অভাবী ও সাহায্যপ্রার্থীকে ধারে কাছে ঘেষ্তে দেয়নি, অর্থ-সম্পদের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণে পৃথিবীকে অমর-অক্ষয় মনে করেছে। তাদের এই ধারণা, বিশ্বাস এবং কর্মকান্ড স্বয়ং তাদের জন্যেই কি বিরাট ক্ষতি ডেকে এনেছে, সেদিন তারা অনুভব করতে পারবে। অনুশোচনা আর অনুতাপে সেদিন তারা ভেঙে পড়বে। প্রকৃত চেতনা সেদিন জাগ্রত হবে, কিন্তু তা কোনই কাজে আসবে না। পরিণতি দেখার পূর্বে পৃথিবীর জীবনে যদি চেতনা জাগ্রত হতো, তাহলে তা কাজে আসতো। কিন্তু কর্মের নিকৃষ্ট পরিণতি দেখার পরে যে চেতনা জাগ্রত হবে, তা অনুশোচনা বৃদ্ধিই করে চলবে।

এই অর্থলোলুপ অভিশপ্ত লোকগুলো সেদিন নিকৃষ্ট পরিণতি দেখে আফসোস করে বলতে থাকবে, সেদিন আমরা যদি নবী-রাসূলদের অনুসরণ করে অন্যের হক বুঝিয়ে দিতাম এবং অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ না করতাম! পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখের জন্য ন্যায়-অন্যায়বোধ ত্যাগ করে অর্থোপার্জন করেছি, কিন্তু অন্তকালের এই জীবনের জন্যে কোন কিছুই এখানে পাঠাইনি। যদি এই চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে পূর্বেই এখানে কিছু পাঠাতাম, তাহলে আজ এমন নিকৃষ্ট পরিণতি বরণ করতে হতো না। অপরাধীরা সেদিন পেছনে ফেলে যাওয়া জীবনের যাবতীয় অপকর্মকে স্মরণ করে আবার নতুনভাবে উপদেশ গ্রহণ করে সৎ পথ অবলম্বন করার জন্য আগ্রহ পোষণ করবে। কিন্তু সেদিন এই স্মরণ এবং আগ্রহ কোনটাই কাজে আসবে না। পৃথিবীর জীবনে সৎকাজ করার যে সুযোগ তার ছিল সে কথা স্মরণ করে সেদিন সে শুধু আক্ষেপই করতে থাকবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, সেদিন তাদের অনুতাপ আর অনুশোচনা তাদেরকে আমার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের অবাধ্যতার কারণে সেদিন তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হবে, যার দৃষ্টান্ত একমাত্র আমি ব্যতীত অন্য কেউ-ই স্থাপন করতে পারবে না। আমি এমনভাবে তাদেরকে সেদিন বাঁধবো, আমার কোন সৃষ্টি তেমনভাবে বাঁধতে সক্ষম নয়। আমি এমন আযাবে সেদিন তাদেরকে নিক্ষেপ করবো, যে আযাব অন্য কারো পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়।

সূরা আল ফজর-এর ২৭ থেকে ৩০ আয়াতে ঐসব নেককার সৎলোকগুলোর কথা বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যারা দ্বিধাহীন চিত্তে, সন্দেহ মুক্ত মনে, কোন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতীতই মানসিক প্রশান্তির সাথে আপন প্রভু মহান আল্লাহ রাব্বুল

আলামীনের বিধান অনুসরণ করেছে। আল্লাহর নিদের্শকে বোঝা মনে করে, শাস্তি মনে করে অনিচ্ছা সত্ত্বে এবং বাধ্য হয়ে তারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি। বরং প্রশান্ত চিত্তে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ-উচ্ছাস আর শ্রদ্ধা মিশ্রিত করে আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ পালন করেছে। আল্লাহ তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তার জটিল দেহকে পরিচালিত করছেন, যে পৃথিবীতে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে, এই পৃথিবীকে তার জন্যে বসবাসের উপযোগী করেছেন, এখানে জীবন ধারণের জন্যে যাবতীয় উপকরণ তিনি সরবরাহ করছেন, তারই জন্য তার প্রভু এই পৃথিবীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে তারই কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তারই কল্যাণে উদ্ভিদ সবুজ-শ্যামলীমার অলঙ্কারে সজ্জিত হচ্ছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে তিনি তাকে করুণাধারায় সিক্ত করছেন। এই অনুভূতিতে সে আপন স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে।

স্রষ্টার প্রতি অসীম মমতা আর শ্রদ্ধায় তার হৃদয়-মন বিগলিত হয়ে সে বার বার আপন রব্বকে সিজ্‌দা দিয়ে, রব্ব-এর প্রতিটি নিদের্শ পরম শ্রদ্ধাভরে সম্মান ও মর্যাদার সাথে অনুসরণ করে নিজের মানসিক প্রশান্তি ব্যক্ত করেছে। আপন প্রভুর নিদের্শ পালন করতে গিয়ে এবং তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে যাবতীয় অত্যাচার-নির্যাতন নিপীড়ন হাসি মুখে বরণ করেছে। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠকে জান্নাতের মতোই মনে করেছে। ফাঁসির রশিকে মনে করেছে জান্নাতী ফুলের মালা। পৃথিবীর জীবনে কোন কষ্টকেই সে কষ্ট বলে মনে করেনি। এসবই করেছে সে আপন রব্ব-এর প্রতি পরম প্রশান্তির কারণে। এই শ্রেণীর লোকদেরকেই কিয়ামতের ময়দানে আহ্বান করা হবে, 'হে প্রশান্ত আত্মা!' বলে। এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু কিয়ামতের ময়দানেই আহ্বান জানানো হবে না, ঐ শ্রেণীর লোকগুলোর মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন দান করেও একইভাবে আহ্বান জানানো হবে।

অপরাধীদের মৃত্যুর সময় যেমন কঠিন আযাবের সাথে তাদেরকে অপমান আর লাঞ্ছনা দিতে দিতে বন্দীশালার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তার বিপরীতে আল্লাহর গোলামদের মৃত্যুর সময় এভাবে আহ্বান জানিয়ে তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হবে যে, তুমি যেমন প্রশান্ত চিত্তে তোমার রব-এর গোলামী করে জীবনকাল অতিবাহিত করেছো, তেমনি তোমার রব-ও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং এগিয়ে চলো আপন মনিবের রহমতের দিকে। সেই মেহ্‌মান খানায় গিয়ে প্রশান্তিদায়ক সুসুপ্তিতে নিমগ্ন হও, যা তোমার মনিব তোমার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

হাশরের ময়দানে পুনর্জীবন দান করে যখন উঠানো হবে, অপরাধীরা ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়বে, তাদেরকে কঠিন বন্ধনে বেঁধে শাস্তি দেয়া হবে, সেই কঠিন দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও আল্লাহর অনুগত গোলামদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হবে, আজকের দিনের কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না, সুতরাং প্রশান্ত চিত্তে অবস্থান করতে থাকো। এই নিশ্চয়তা দেয়া হবে মধুমাখা শব্দে, মমতা সিক্ত ভাষায়। পরিশেষে ঐ একই আহ্বান জানিয়ে বলা হবে, তোমরা যেমন আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে, আমিও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম। এখন চলো তাঁরই দিকে, যাঁর সাথে তোমাদের প্রকৃত সম্পর্ক। এই সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে তোমরা পৃথিবীতে অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেছো। তবুও আপন প্রভুর সাথে গোলামীর সম্পর্কে কোন ফাটল ধরতে দাওনি।

আমার সাথে ছিল আমার প্রিয় বান্দাহ্দের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, পরম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আমার প্রতি ছিল তাদের হৃদয়ে অদম্য আকর্ষণ, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে যারা দিবারাত্রি প্রতি মুহূর্তে ছিল ব্যাকুল। যারা পৃথিবীতে প্রতিটি কাজেকর্মে আমার নির্দেশ কি, তার অনুসন্ধান করে তা অনুসরণ করেছে, আমিও আমার সেই ব্যাকুল গোলামদের জন্যে, প্রিয় বান্দাহ্দের জন্যে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি, যেখানের সুখ-শান্তি কখনো কোনদিন শেষ হবে না, সেই অশেষ সুখময় স্থান জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ করো। ঐ জান্নাত তোমাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে শেষ কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ-اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ-اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

(১) সময়ের শপথ! (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত আছে), (৩) সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তা'য়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে সেই (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে এবং এরা একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।

মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সূরা আসরে চারটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এবং সফলতা সম্পর্কে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষসহ যাবতীয় প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জীবন ধারনের ব্যবস্থাও স্বয়ং তিনিই করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি প্রয়োজনীয় পথনির্দেশনা দিয়েছেন এবং মানুষকেও তিনি জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এমন কোনো পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম নয়, যে পথে চললে সে পৃথিবী ও আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু নিচয় ব্যবহারের জ্ঞান মানুষকে দেয়া হয়েছে আর সফলতা ও ব্যর্থতার পথনির্দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ কোন্ পথ অবলম্বন করে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করলে মানুষ পৃথিবী ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারবে, সে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তিনি সে পথপ্রদর্শন করেছেন।

তিনি সফলতা ও ব্যর্থতার পথ মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, কোন্ পথ অবলম্বন করলে মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, আর কোন্ পথ অবলম্বন করলে মানুষের এই উভয় জগতের জীবন সাফল্যমন্ডিত হবে। সূরা আসরে মানুষের স্রষ্টা, মানুষের সফল জীবনে উত্তম প্রতিদান দেয়ার মালিক এবং ব্যর্থ জীবনে অশুভ পরিণতি ভোগ করানোর মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কোনো ব্যক্তি বিশেষকে, কোনো দল-গোষ্ঠীকে বা কোনো বিশেষ দেশের মানুষকে লক্ষ্য করা এ কথা বলা হয়নি যে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। বরং 'ইনসান' শব্দ ব্যবহার করে গোটা মানবমন্ডলীকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তারা মহাক্ষতিতে নিমজ্জিত। সমস্ত মানুষ ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে ধাবমান।

এতটুকু বক্তব্য পেশ করে মানবমন্ডলীকে হতাশার অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত করা হয়নি। সাথে সাথে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, কোন্ পথ অবলম্বন করলে এবং কোন্ কাজসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করলে মানুষ সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। মানুষের পৃথিবী ও আখিরাতের জীবন কল্যাণময় হবে, তা আলোচ্য সূরা আসরে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রথমেই বলা হয়েছে, মানুষকে ঈমান আনতে হবে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেভাবে ঈমান আনতে বলেছেন, তেমনভাবে ঈমান আনতে হবে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, শুধু ঈমান আনলেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা যাবে না। সেই সাথে ঈমানের দাবি অনুসারে আমলে সালেহ্ করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল পৃথিবীতে জীবন-যাপনের লক্ষ্যে যে বিধান পেশ করেছেন, সেই বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয়ত ঈমান এনে ও আমলে সালেহ্ করে যে ব্যক্তি মহাক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সফলতা ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি শুধুমাত্র স্বার্থপরের মতো নিজেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকবে না, অন্য মানুষকেও মহাক্ষতি থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে 'হক'-এর দাওয়াত দেবে। অর্থাৎ যে জীবন ব্যবস্থা অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করলে মহাক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে এবং সফলতা অর্জিত হবে বলে সে বিশ্বাস করে তা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করছে, সেই জীবনাদর্শ অনুসরণ করার জন্য অন্য মানুষকেও আহ্বান জানাবে। যার ভেতরে কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে অনুসরণ করছে, তা মানুষ সমাজে প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথে সদাতৎপর থাকবে।

মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার ও সফলতা অর্জন করার চতুর্থ বিষয়টি হলো, 'হক' অনুসরণ করতে গিয়ে এবং 'হক'-এর প্রচার-প্রসার ও তা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে বিপদ-মুসিবত, ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট, বাধা-প্রতিবন্ধকতা সম্মুখে আসবে তার মোকাবেলায় ধৈর্য তথা 'সবর' অবলম্বন করতে হবে। 'হক'-এর অনুসরণ করতে গেলে এবং মানব সমাজে 'হক'-এর প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গেলে 'হক' বিরোধী গোষ্ঠী ময়দান ছেড়ে দেবে না। সম্মুখে তারা প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তুলে দেবে। 'হক' অবলম্বনকারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে, মিথ্যাচার ছড়াবে, শারীরিকভাবে প্রহৃত করবে, অপমান ও লাঞ্ছিত করবে। সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে। কারাগারে নিক্ষেপ করবে, ফাঁসির রশিতে ঝুলাবে। দেশ থেকেও বিতাড়িত করবে। নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে দেবে। এসব কিছুর মোকাবেলায় সর্বোত্তম ধৈর্য ধারণ করে 'হক'-এর পথে অটল-অবিচল থাকতে হবে, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাথে যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে মন্‌যিলের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং এর নামই হলো ধৈর্য।

এই চারটি কাজ বিশ্বস্ততার সাথে আঞ্জাম দিতে পারলেই মহাক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সফলতা অর্জন করা যাবে। আর এই চারটি কথাই আলোচ্য সূরা আসরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূল এবং তাঁদের সাহাবায়ে কেরাম এই চারটি কাজ করেছেন। যুগে যুগে যাঁরা সফলতার পথ অবলম্বন করেছেন, তাঁরাও এই চারটি কাজকে জীবনের অন্য সকল কাজের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই চারটি কাজ যারা সফলভাবে করতে পেরেছেন, তাঁরাই মহান আল্লাহর রহমতের দৃষ্টির আওতায় এসেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছেন। কবি বলেন–

পড়্গিয়া যিছ্ পর নযর বান্দাকো মাওলা কর দিয়া

আগিয়া যিছ্ দাম মে জোশ্, কাত্রা কো দরিয়া কর দিয়া।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমতের দৃষ্টি যদি তাঁর কোনো গোলামের প্রতি নিপতীত হয়, তাঁর সে গোলাম বাদশায় পরিণত হয়ে যায়। তাঁর রহমতের দৃষ্টি যদি এক ফোঁটা পানির প্রতি নিপতীত হয়, সে পানি ফোঁটা অগাধ জলধীতে পরিণত হয়ে যায়।

আল্লাহর কোরআনের গবেষকগণ বলেছেন, মানুষ যদি সূরা আসর সম্পর্কে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তাহলে মানুষের হেদায়াতের জন্য এই সূরাটিই যথেষ্ট। আল্লাহর রাসূলের সাহাবাদের দৃষ্টিতে এই সূরাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হলেই তারা একে অপরকে এই সূরাটি তেলাওয়াত করে শোনাতেন। তাঁরা একে অপরকে এই সূরা না শুনিয়ে বিদায় গ্রহণ করতেন না। এই সূরাটির ছোট্ট ছোট্ট বাক্যে ব্যাপক অর্থবোধক ও ভাবপ্রকাশক মর্ম নিহিত রয়েছে। এই ছোট্ট সূরাটির মধ্যে ভাবের এক মহাসমুদ্র প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এই সূরাটির মূল আলোচিত বিষয় হলো, মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ কোনটি এবং কোন্ পথে তার ধ্বংস ও বিপর্যয় তা স্পষ্টভাবে এই সূরায় বলে দেয়া হয়েছে। মাত্র তিনটি আয়াতের সমাহার এই ক্ষুদ্র সূরার ভেতরে মানব জীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বিদ্যমান রয়েছে। যেন ক্ষুদ্র ঝিনুকের মধ্যে একটি মহাসমুদ্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সুতরাং সূরা আসরের তাফসীর অধ্যয়ন করা একান্তই জরুরী।

এই সূরার তাফসীর করে শেষ করা যাবে না। শেষ পর্যায়ে পুনরায় চিরসত্য সেই কথাটি উল্লেখ করছি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদার পদ এবং অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হবার অর্থ সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতার অর্থ হলো, আলোচ্য সূরায় বর্ণিত চারটি গুণকে নিজ চরিত্রের অলঙ্কারে পরিণত করা। যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতি ও পরিবেশকে বুদ্ধিমত্তার সাথে অতিক্রম করে নিজেকে মহান আল্লাহর গোলাম হিসেবে গড়ে তোলার নামই হলো সফলতা।

বস্তুত এই সূরায় বিবৃত চারটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সেই কল্যাণ ও মঙ্গলের সৌরভে সুবাসিত মানব সমাজ ও রাষ্ট্র, যে সমাজ ও রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। আজো পৃথিবীর মানুষ যাবতীয় শোষণ-লুণ্ঠন, নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন-নিষ্পেষন থেকে মুক্তি লাভ করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, নিরাপত্তাপূর্ণ, শোষণমুক্ত-ভীতিহীন সমাজ ও রাষ্ট্র লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি সূরা আসরে বর্ণিত চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক ভূষণে পরিণত করতে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে কোরআনের শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তাওফিক এনায়েত করুন। আমীন।

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাচ্ছির
আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি
কর্তৃক রচিত বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

সূরা ফাতিহা, সূরা আল-আসর, সূরা লুকমান, আমপারার
তাফসীরসহ আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ

১. আল-কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ
২. মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কোরআন
৩. আল-কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান
৪. আল-কোরআনের মানদণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা
৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা
৬. দ্বীনে হক-এর দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি
৭. বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন- ১ ও ২
৮. মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২
৯. আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি
১০. আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?
১১. হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
১২. শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে
১৩. কাদিয়ানীরা কেন মুসলিম নয়?
১৪. জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ
১৫. রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মোনাজাত
১৬. আল্লাহ কোথায় আছেন?
১৭. আখিরাতের জীবনচিত্র
১৮. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১-২৭৬৪৭৯